হযরত ইমাম গায্যালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

প্রথম খণ্ড ঃ দর্শন ও ইবাদত

আবদুল খালেক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ভূমিকা ২১

দর্শন

প্রথম অধ্যায় ঃ আপনার পরিচয় বা আত্মদর্শন ২৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আল্লাহ্‌র পরিচয় (তত্ত্ব দর্শন) ৬১
তৃতীয় অধ্যায় ঃ দুনিয়ার পরিচয় ৮৬
চতুর্থ অধ্যায় ঃ পরকালের পরিচয় ৯৫

ইবাদত

প্রথম অধ্যায় ঃ সুন্নী মতানুসারে ধর্মবিশ্বাস দৃঢ়করণ ১৩০
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইল্‌ম অন্বেষণ ১৩৮
তৃতীয় অধ্যায় ঃ পবিত্রতা ১৪৫
চতুর্থ অধ্যায় ঃ নামায ১৬৪
পঞ্চম অধ্যায় ঃ যাকাত ১৮৮
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রোযা ২০৮
সপ্তম অধ্যায় ঃ হজ্জ ২১৭
অষ্টম অধ্যায় ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ২৪২
নবম অধ্যায় ঃ আল্লাহ্‌র যিকির ২৫২
দশম অধ্যায় ঃ ওযীফার তরতীব ২৭০

হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

এই বিশ্ববরেণ্য মহামনীষীর নাম আবূ হামিদ মুহম্মদ। তাঁহার পিতার ও পিতামহ উভয়ের নামই মুহাম্মদ। তাঁহার মর্যাদাসূচক পদবী হুজ্জাতুল ইসলাম। খোরাসানের অন্তর্গত তুস জেলার তাহেরান নগরে গাযালা নামক স্থানে হিজরী ৪৫০ সনে, মুতাবিক ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইমাম সাহেব (র)-এর যুগে পারস্যের সম্রাট ছিলেন সলজূক বংশীয় সুলতান রুক্নুদ্দীন তোগরল বেগ। সলজূক বংশীয় সুলতানগণের রাজত্বকাল মুসলমানগণের চরম উন্নতির যুগ ছিল। তাঁহাদের পূর্বে ইরান শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বুইয়া বংশীয়রাজাদের শাসনাধীন ছিল। এই সময়ে মুসলিম শক্তিসমূহ পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ,আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সলজূক বংশীয় তুর্কিগণ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রাক-ইসলামিক স্বভাব-চরিত্র ও মূল্যবোধে আমূল বিবর্তন সাধিত হয় এবং তাঁহাদের মাধ্যমে এক অনুপম সভ্যতা গড়িয়া ওঠে। ফলে তাঁহারা মুসলিম-বিশ্বের লুপ্তপ্রায় শক্তি ও প্রতিভাকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম হন। এই শক্তির অভ্যুদয়ের কারণে খ্রিস্টান-শক্তির অগ্রগতি রহিত হয় এবং সমগ্র এশিয়ার এক বিরাট অংশ এই সুলতানগণের অধীনে আসিয়া পড়ে।

এই যুগে মুসলমানদের বিদ্যার্জন-স্পৃহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তৎকালে প্রচলিত ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও পারসিকদের জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করিয়া প্রাচীন গ্রীক, মিসরীয় ও ভারতীয় জ্ঞানাহরণে তাঁহারা প্রবৃত্ত হন; এই জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্র, জড়বাদ, নাস্তিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মতবাদের সংমিশ্রণে মুসলমান সমাজে বহু মতানৈক্যের সূত্রপাত হয় এবং ইসলামী আকাইদ ও জ্ঞানের সহিত নানাবিধ মারাত্মক অনৈসলামী ধর্ম-বিশ্বাস ও জ্ঞান এমনভাবে মিশিয়া পড়ে যে, খাঁটি ইসলামী আকাইদ ও অনৈসলামী আকাইদে পার্থক্য করাই দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। অত্যধিক পরিমাণে পার্থিব জড়জ্ঞানের প্রভাবে ধর্ম জ্ঞানের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং মুসলমান সমাজে আকাইদ ও ধর্ম-কার্যের ক্ষেত্রে এক চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে সমাজকে রক্ষার দায়িত্বই হযরত ইমাম গাযালী (র)-র উপর অর্পিত হয়। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের অতুলনীয় প্রতিভা যে নিপুণতার সহিত এই দায়িত্ব সমাপন করিয়াছে, সমগ্র বিশ্ব তজ্জন্য বিস্ময় ও ভক্তিআপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাকে কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করিবে।

তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা

তৎকালে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রাথমিক স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছাত্রগণের খাওয়া পরার খরচসহ মাদ্‌রাসার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করিতেন। তদুপরি সকল মসজিদ ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের গৃহেও বহু বেসরকারি মাদ্‌রাসার ব্যবস্থা ছিল। দূরদেশীয় ছাত্রদের ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় ব্যয়ভার আমীর উমরাহ্‌গণ বহন করিতেন। সুতরাং সেইকালে শিক্ষার পথ ধনী-নির্ধন সকলের জন্যই অত্যন্ত সুগম ছিল। প্রবীণ ও উচ্চশিক্ষিত সুধীজন যে সকল স্থানে শিক্ষাদান করিতেন, সে সব স্থানই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হইত। এমতাবস্থায় অতিসহজে জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিত।

শৈশবকাল ও ছাত্রজীবন

ইমাম সাহেব (র)-এর পিতা ছিলেন দরিদ্র; তথাপি তিনি পুত্রের শিক্ষার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। ইমাম সাহেব (র) অতি শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। অন্তিমকালে তাঁহার পিতা তাঁহার জনৈক বন্ধুর উপর দুইপুত্র আহ্‌মদ ও মুহম্মদের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার অর্পণ করেন এবং তজ্জন্য সামান্য অর্থ প্রদান করেন। শিশুদ্বয় অসাধারণ মেধা-শক্তির অধিকারী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই পবিত্র কুরআন হিফ্‌য সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা শহরের এক মাদ্‌রাসায় ভর্তি হইয়া অধ্যয়ন শুরু করেন। আল্লামা আবূ হামিদ আসকারায়েনী, আল্লামা আবূ মুহম্মদ যোবায়নী প্রমুখ মহাজ্ঞানী উস্তাদের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। খ্যাতনামা ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদ আল্লামা আহ্‌মদ বিন মুহম্মদ রাযকানীর নিকট তিনি ফিকাহ্‌শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য জুরজানে গমন

তাহেরানে শিক্ষা সমাপ্তির পর ইমাম সাহেব (র) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য জুরজান শহরে গমন করেন। এখানে তিনি হযরত ইমাম আবূ নসর ইসমাঈল (র)-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পুত্রবৎ স্নেহে সর্বশক্তি প্রয়োগে তিনি তাঁহাকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে শিক্ষকগণ পাঠ্য বিষয়ে যে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন শিক্ষার্থীগণকে উহা হুবহু লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে বাধ্য করিতেন। এই লিখিত নোটগুলিকে তা'লীকাত বলা হইত। এইরূপে হযরত ইমাম গাযালী (র) তা'লীকাতের এক বিরাট দপ্তর সঞ্চয় করিলেন।

তাহেরানা অভিমুখে যাত্রার পথে সর্বস্ব লুণ্ঠন

জুরজানের অধ্যয়ন সমাপনান্তে ইমাম সাহেব জন্মভূমি তাহেরান অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে দস্যুদল তা'লীকাতসহ তাঁহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। টাকা-পয়সা ও পোশাক-পরিচ্ছদ অপহৃত হওয়াতে তিনি কোন পরোয়া করিলেন না। কিন্তু তা'লীকার অপহরণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এইগুলি ফেরৎ দেয়ার জন্য দস্যু সরদারের নিকট তিনি এই বলিয়া অনুরোধ জানাইলেন যে, উহাতে তাঁহার সমস্ত অর্জিত বিদ্যা সঞ্চিত রহিয়াছে। দস্যু-সরদার উপহাসের স্বরে বলিল ঃ তুমি তো বেশ বিদ্যা অর্জন করিয়াছ! সবই কাগজে রহিয়াছে, মনে কিছুই নাই। এই কথা বলিয়া সে তা'লীকাত ফিরাইয়া দিল। সরদারে ব্যাঙ্গোক্তি ইমাম সাহেবের মনে দাগ কাটিল। অনন্তর অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত তা'লীকাত তিনি মুখস্ত করিয়া লইলেন।

নিযামিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন

খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে অবস্থিত নিযামিয়া মাদ্‌রাসা তৎকালে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। জুরজানের অধ্যয়ন সমাপ্তির পরও ইমাম সাহেবের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত হইল না। তাই তিনি নিযামিয়া মাদ্‌রাসায় গমন করিলেন। সেকালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমরূপে স্বীকৃত ইমামুল হারামাইন (র) ছিলেন এই মাদ্‌রাসার প্রধান অধ্যক্ষ। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে বহু লোক উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত। তিনি এত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, গোটা দুনিয়ার সুলতানগণও জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইত। ইমাম সাহেব (র) উপযুক্ত উস্তাদ পাইয়া তাহার তীব্র জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন। ইমামুল হারামাইনও ইমাম সাহেবকে দর্শন ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে খুব আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

৪৭৮ হিজরীতে ইমামুল হারমাইন (র) ইন্তিকাল করেন। তিনি ছাত্রগণের নিকট এত প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার ইন্তিকালে উন্মাদ প্রায় হইয়া পড়েন। কেউ বা বহুদিন যাবৎ শিশুর ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁহার চারিশত ছাত্রের সকলেই নিজ নিজ দোয়াত-কলম ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং জামে-মসজিদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেন। কারণ, ইহাদের সহিত তাহাদের প্রিয় উস্তাদের স্মৃতি বিজড়িত ছিল এবং এইগুলি তাহাদের হৃদয়ের শোকাগ্নিকে অধিকতর প্রজ্বলিত করিয়া তুলিত। ছাত্রগণ প্রায় একবৎসর কাল উস্তাদের শোকে মুহ্যমান হইয়া থাকেন। ইমাম গাযালী (র)-র নিকটও উস্তাদের তিরোধান-যাতনা অসহনীয় হইয়া উঠিল এবং নিশাপুর তাঁহার নিকট অন্ধকার পুরির ন্যায় মনে হইতে লাগিল। তাই তিনি নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া বাগদাদে চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে হযরত গাযালী (র)-র বয়স ছিল মাত্র ২৮ বছর। তিনি জানিতেন যে, কেবল কিতাব পাঠ আল্লাহ্‌র জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট নহে ; ইহার জন্য দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন জীবন্ত উস্তাদের নিতান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত পীরে কামেল হযরত শায়খ আবূ আলী ফারমেদী (র)-র হস্তে বাইয়াতপূর্বক তাঁহার মুরীদ হন।

মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদে ইমাম সাহেব (র)

বাগদাদে তখন তুর্কীরাজ মালেক শাহের আধিপত্য ছিল। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী হাসান বিন আলী নিযামুল মুল্‌ক একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় 'মাদ্‌রাসায়ে নিযামিয়া' এবং উহার পাঠ্যতালিকা 'দরসে নিযামী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত হযরত ইমাম সাহেবকে মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর, এত অল্প বয়সেও তিনি অধ্যাপনা ও পরিচালনা কার্যে নিতান্ত দক্ষতা ও নিপুণতার পরিচয় প্রদান করেন। স্বয়ং বাদশাহ ও রাজপুরুষগণও রাজকার্যের জটিল সমস্যাসমূহে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এ সময় তাঁহার নাম দুনিয়ার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন দেশ হইতে শত শত ছাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য ছুটিয়া আসেন। মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার খ্যাতিও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপনার সাথে সাথে তিনি নানা জটিল বিষয়ে গবেষণাও করিতে থাকেন। এরূপে তিনি অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী হন।

মাদ্‌রাসা নিযামিয়া পরিত্যাগ

প্রভূত যশ ও যোগ্যতার সহিত ইমাম গাযালী (র) চারি বৎসরকাল মাদ্‌রাসা নিযামিয়াতে কাজ করেন। নানা জটিল বিষয়াদির চমৎকার ব্যাখ্যা শ্রবণ ও তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ছাত্রগণ একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িত। এখানে অবস্থানকালে তিনি দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তথাপি তাঁহার মন পরিতৃপ্ত হইল না। কিসের অভাবে যেন তাঁহার মন আনচান করিতে লাগিল। অজানাকে জানিবার এবং অদেখাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাবতীয় কর্মের প্রতি তাঁহার মন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুল বুঝিলেন যে, কেবল পুঁথিগত জ্ঞান দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে একাগ্র সাধনা ও কঠোর রিয়াযতের আবশ্যক। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন ঃ "মানুষের সদ্‌গুণরাজির বিকাশের জন্য অক্লান্ত সাধনা ও একনিষ্ঠ সংযমের একান্ত আবশ্যক।" এই উপলব্ধির পর স্বীয় স্বভাব ও কর্মের প্রতি মনোনিবেশপূর্বক দেখিলাম, আমার কোন কাজই এই নীতির অনুরূপ নহে, যাহার দ্বারা আমার স্বভাব, আত্মা ও মানবতার উন্নতি সাধন হইতে পারে। আমি আরও বুঝিতে পারিলাম যে, আমি প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কার্য করিতেছি এবং একমাত্র

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমার কোন কাজ হইতেছে না। তবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ-লাভের নিমিত্ত লোকালয়ে অবস্থান করিয়াই দুনিয়ার সকল মোহ বর্জন করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যাবতীয় কর্মের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যভাব জন্মিতে লাগিল। মাদ্‌রাসার অধ্যাপনা এবং পরিচালনার কার্যেও শৈথিল্য দেখা দিল, মৌনাবলম্বনের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইল; হযম শক্তি কমিতে লাগিল এবং ঔষধেও অশ্রদ্ধা জন্মিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন, "এমতাবস্থায় কোন ঔষধই ফলপ্রদ হইবে না।" অনন্তর দেশ ভ্রমণে বাহির হওয়ার মনস্থ করিলাম। দেশের আমীর-উমরাহ, আলিম-উলামা, সুধীমণ্ডলী এবং রাজপুরুষগণ এই সংকল্প পরিত্যাগের জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি মনকে বশে আনিতে পারিলাম না। পরিশেষে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া হিজরী ৪৮৮ সনের যিলকাদাহ্ মাসে আমি গোপনে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

হযরত ইমাম গাযালী (র) এক অসাধারণ অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জাগতিক জ্ঞান তাঁহার মনের তীব্র পিপাসা নির্বাপিত করিতে পারে নাই। তাই তিনি এবার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও জ্ঞান পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সকল দার্শনিকের মতবাদও গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিনি অধ্যয়ন করেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার মনের জিজ্ঞাসার কোন সঠিক জবাব তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। তাই এক অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে সংসারবিরাগী সুফী-দরবেশের বেশে জীবনের দীর্ঘ দশটি বৎসর নানা দেশ পর্যটনে তিনি অতিবাহিত করেন। এই পথেই তিনি তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত রহস্যের সন্ধান খুঁজিয়া পান। তাঁহার মন চিররহস্যময় আল্লাহ্‌র স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয় এবং তাঁহার অন্তরের পিপাসা নিবারিত হয়।

কথিত আছে, মাদ্‌রাসা নিযামিয়াতে অবস্থানকালে হযরত ইমাম সাহেব (র) মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। কিন্তু দেশ পর্যটনের সময় তিনি নিতান্ত সাধারণ পরিচ্ছদে একটি মোটা কম্বল সম্বল করিয়া বাহির হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাকে খুব প্রফুল্ল দেখাইত। সিরিয়ার পথে তিনি কিছুকাল দামেশক নগরিস্থিত উমায়্যা জামে মসজিদে অবস্থান করেন। তৎকালে এই মসজিদের পার্শ্বে একটি বিরাট মাদ্‌রাসা ছিল। হযরত ইমাম সাহেব (র) এই মসজিদের পশ্চিম প্রান্তস্থিত মিনারার এক প্রকোষ্ঠে স্বীয় বাসস্থান নির্ধারণ করেন এবং অধিকাংশ সময়ই ইহাতে মুরাকাবা-মুশাহাদায় নিমগ্ন থাকেন।

অবসর সময়ে তিনি কিছুসংখ্যক অতি আগ্রহী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিতেন এবং সময় সময় আলিমগণের সহিত জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করিতেন।

বায়তুল মাক্‌দাস গমন ও নির্জনবাস অবলম্বন

দুই বৎসর দামেশ্‌ক নগরে অবস্থানের পর তিনি বায়তুল মাক্‌দাসে গমন করেন। ইহার কারণস্বরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া মসজিদ সংলগ্ন মাদ্‌রাসায় গমন করেন এবং ইহার প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আলোচনাকালে শিক্ষক সাহেব বলেন ঃ ইমাম গাযালী সাহেব এ সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন। এই প্রশংসা তাঁহার মনে অহংকারের সৃষ্টি করিতে পারে ভাবিয়া হযরত ইমাম সাহেব (র) তথা হইতে সংগোপনে বায়তুল মাক্‌দাসে চলিয়া যান। তথায় তিনি 'সাখরাতুস্‌সাম্মা' নামক বিখ্যাত প্রস্তরের নিকটবর্তী এক নির্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি ইহাতে সর্বদা যিকর-ফিকরে মশগুল থাকিতেন এবং সময় সময় নিকটবর্তী পবিত্র মাযারসমূহ যিয়ারতে বাহির হইতেন।

মকামে খলীলে তিনটি প্রতিজ্ঞা

বায়তুল মাক্‌দাসের যিয়ারত শেষ করিয়া তিনি 'মকামে খলীল' নামক স্থানে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের মাযার শরীফ যিয়ারতে গমন করেন। সেখানে তিনি তিনটি প্রতিজ্ঞা করেন ঃ (১) কখনও কোন রাজদরবারে যাইব না, (২) কোন বাদশাহের বৃত্তি বা দান গ্রহণ করিব না এবং (৩) কাহারও সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইব না।

বায়তুল মাকদাসে অবস্থানকালে ইমাম সাহেব (র) অনেক সময় মসজিদে আকসায় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন।

মদীনা শরীফ যিয়ারত

বায়তুল মাক্‌দাস হইতে হযরত ইমাম সাহেব (র) মদীনা শরীফে গমন করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারক যিয়ারত করেন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন।

হজ্জ সমাপন ও দেশ পর্যটন

মদীনা শরীফ হইতে তিনি মক্কা শরীফে গমন করেন এবং পবিত্র হজ্জ উদ্‌যাপন করেন। এখানেও তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বহু বুযুর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন।

তৎপর সেখান হইতে তিনি বিশ্ববিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া পরিদর্শনে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার পথে তিনি আবার পবিত্র মক্কা-মদীনা যিয়ারত করেন।

বাগদাদ হইতে বাহির হইয়া সুদীর্ঘ দশ-এগার বৎসরকাল তিনি বহু বন-জঙ্গল, জনপদ ও মরুপ্রান্তর পরিভ্রমণ করেন। বলাই বাহুল্য যে, তৎকালে যাতায়াতের জন্য বাহন পশু ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এত কষ্টকর ভ্রমণেও তাঁহার ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত -মুজাহাদায় কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় নাই। ফলে তাঁহার অন্তর-আত্মা সম্পূর্ণরূপে নির্মল ও পরিষ্কার হইয়া পড়ে এবং দিব্যজ্ঞানের পথে সমস্ত পর্দা একেবারে অপসারিত হইয়া যায়।

পুনরায় মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদ

হযরত ইমাম গাযালী (র) উপলব্ধি করিলেন যে, সমগ্র দুনিয়া ধর্মের দিক হইতে মোড় ঘুরাইয়া লইতেছে এবং মুসলমানগণ ধর্ম-কর্মে দিনদিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। জড়বাদী দর্শন-বিজ্ঞানের ঝড়-ঝঞ্ঝার সংঘাতে ধর্মের সূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এইজন্য নির্জনবাস পরিত্যাগপূর্বক তিনি ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগের মনস্থ করিলেন। বাগদাদ অধিপতি সুলতান মালেক শাহের পুত্র সুলতান সানজার সালজুকীর প্রধানমন্ত্রী ফখরুল মুলক (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলকের জ্যেষ্ঠপুত্র) এই সময় আবার মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের জন্য হযরত ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করেন। নির্জনবাস পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম-শিক্ষা প্রসারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণও তাঁহাকে পরামর্শ দিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত স্বপ্নযোগেও বহু পরিত্রাত্মা তাঁহাকে এই পরামর্শই প্রদান করেন। সুতরাং দেশে প্রত্যাবর্তন করত হিজরী ৪৯৯ সালের যিলকাদাহ মাসে পুনরায় তিনি মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়া যথারীতি ধর্মশিক্ষা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অতিশয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত এই কার্যনির্বাহ করিতে থাকেন।

ইমাম সাহেবের মাদ্‌রাসা নিযামিয়া পরিত্যাগ

হিজরী ৫০০ সালের মহররম মাসে প্রধানমন্ত্রী ফখরুল মুলক এক দুরাচার গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার অনতিকাল পরই হযরত ইমাম সাহেব (র) মাদ্‌রাসা নিযামিয়া পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় বাসভবনের অনতিদূরে একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে ইল্‌মে দীন শিক্ষার্থী ও আল্লাহ্‌র পথের পথিকদিগকে শিক্ষা দিতে থাকেন। বাকি জীবন তিনি এই স্থানে এবং এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

হিংসার কোপে ইমাম সাহেব (র)

মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষপদ পুনঃগ্রহণের জন্য বাগদাদাধিপতি সুলতান সানজার সুলজুকী ইমাম সাহেব (র)-কে বারবার অনুরোধ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে তিনি রাযী হন নাই। এই সুযোগে হিংসাপরায়ণ কতিপয় লোক তাঁহার বিরুদ্ধে

সুলতানকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পায়। সুলতান হানাফী মাযহাবালম্বী ছিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট অভিযোগ করিল যে, 'মন্‌খুল' কিতাবে ইমাম গাযালী সাহেব হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। ইহাতে ইমাম গাযালী (র)-র প্রতি সুলতানের অসন্তোষের উদ্রেক হয়। রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য হযরত ইমাম সাহেবের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী তিনি দরবারে উপস্থিত হইলে সুলতান দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনে বসান। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "ইহা সত্য নহে। তাঁহার সম্বন্ধে আমার সেই বিশ্বাসই বলবৎ আছে, যাহা আমি 'ইয়াহইয়াউল উলূম' কিতাবে প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহাকে আমি ফিকাহশাস্ত্র যুগস্রষ্টা ইমাম বলিয়া স্বীকার করি।" ইহাতে সুলতানের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল।

নিযামিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদ পুনঃগ্রহণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান

হযরত ইমাম গাযালী (র) মাদ্‌রাসা নিযামিয়া পরিত্যাগ করার পর ইহার যশঃগৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহা পুনরুদ্ধারের জন্য আমীর-উমরাহ ও রাজপুরুষগণ নানা উপায়ে তাঁহাকে উহার অধ্যক্ষ পদে পুনঃঅধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিতে থাকেন। সালজুকী সুলতান এবং খলীফার দরবার হইতেও তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ অনুরোধপত্র আসিতে থাকে। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে তিনি উহা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন ঃ

১. তুসনগরে বর্তমানে আমার নিকট দেড়শত ছাত্র অধ্যয়নরত রহিয়াছে। আমি বাগদাদে চলিয়া গেলে তাহাদের পক্ষে সেখানে যাওয়া দুঃসাধ্য হইবে।

২. পূর্বে আমার কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি সন্তান দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে ছাড়িয়া বাগদাদে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

৩. মাকামে খলিলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার বিতর্কে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু বাগদাদে ইহা হইতে অব্যাহতির উপায় নাই।

৪. খলিফার সম্মানার্থে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। আমার ইহা বরদাশত হইবে না।

৫. রাজদরবার হইতে কোন বেতন বা বৃত্তি গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বাগদাদে আমার কোন সম্পত্তি নাই। সুতরাং কিরূপে আমি বাগদাদে অবস্থান করিব?

মোটকথা সর্বপ্রকার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি উক্ত অধ্যক্ষ পদ গ্রহণে আর সম্মত হন নাই। জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি তুস নগরেই অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থ রচনায় ইমাম গাযালী (র)

জ্ঞানের আলো বিতরণের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর এ মরজগতে আবির্ভাব। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যে অবদান তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। এই মহামনীষী মাত্র ৫৫ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। শৈশব ও পাঠ্য-জীবন বাদ দিলে মাত্র ৩৪/৩৫ বৎসর কর্মজীবনে তিনি প্রায় চারিশত অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'ইয়াকুতুততাবলীগ' নামক তফসীর পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত এবং 'ইয়াহইয়াউল উলুম' বিরাট চারি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেকটি খণ্ডও আবার দশটি পৃথক অংশে বিভক্ত। দশ-এগার বৎসর আবার তিনি দেশ পর্যটন ও নির্জনবাসে অতিবাহিত করেন। তদুপরি অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, ধ্যান-সাধনা ও ইবাদত-বন্দেগীতে প্রত্যহ কিছু সময় ব্যয় হইত। তাঁহার দরবারে শিক্ষার্থী ও দীক্ষা প্রার্থীদের সংখ্যা কোনদিনই দেড়শতের কম হইত না। এতদ্ব্যতীত বহু দূরদূরান্ত হইতে নানা জটিল বিষয়ে ফত্ওয়ার জন্য অনেক লোক তাঁহার দরবারে আগমন করিত এবং ওয়াজ-নসীহত ও বিতর্ক-সভাও তাঁহাকে করিতে হইত। উহাতেও কম সময় ব্যয় হইত না। এতসব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া অসাধারণ প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছেন।

আল্লামা নববী বলেন ঃ ইমাম গাযালী (র)-এর সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল (জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত) ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর হিসাবান্তে আমি গড় করিয়া দেখিয়াছি, তিনি গড়ে প্রত্যহ ১৬ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন।

দর্শন, তর্ক, ইলমে কালাম, ধর্মতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব স্বভাব-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ঃ

ফিকাহ

ওয়াসীত, বাসীত, ওয়াজীয, বয়ানুল কাওলায়নিলিশ শাফীঈ তা'লীকাতুন ফী-ফুরুইল মযহাব, খোলাসাতুর রাসাইল, ইখতিসারুল, মুখতাসার, গায়াতুল গাওর, মজমুআতুল ফতাওয়া।

ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি

তাহ্‌সীনুল মাখায, শিফাউল আলীল, মুনতাখাল ফী ইলমিল জিদ্‌ল, মনখুল, মুসতাসফা, মাখায় ফিল খিলাফিয়াত, মুফাসসালুল খিলফি ফী উসুলিল কিয়াস।

মানতিক ঃ মি'য়ারুল ইলম, মীযানুল, আ'মল (ইউরোপে প্রাপ্তব্য)

দর্শন ঃ মাকাসিদুল ফালাসিফাহ (ইউরোপে সংরক্ষিত)।

ইলমি কালাম ঃ আহাতাফুল ফালাসিফাহ্, মুনকিয, ইলজামুল আওয়াম ইকতিসাদ্,মসতাযহারী ফাযাইহুল ইবাহিয়্যাহ্ হাকীকাতুররুহ, কিসতাসুল মুস্তাকীম, কাওলুল জমীল ফী রাদ্দিন আলা মান গায়্যারাল ইঞ্জীল, মাওয়াহিবুল বাতিনিয়্যাহ, তাফাররাকাতুম বায়নাল ইসলামি ওয়াল যিন্দিকাহ্, আর রিসালাতুল কুদসিয়্যাহ্।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয় ঃ ইয়াহইয়াউল উলুম, কিমিয়ায়ে সাআদাত, আল-মাকসুদুল আকসা, আখলাকুল আবরার, জওয়াহিরুল কুরআন, জওয়াহিরুল কুদসি ফী হাকীকাতিন্নাফ্স্ মিশকাতুল আনওয়ার, মিনহাজুল আবেদীন, মি'রাজুস সালিকীন, নাসীহাতুল মূলক, আয়্যুহাল ওলাদ, হিদায়াতুল হিদায়াহ্, মিশকাতুল আনওয়ার ফী লাতাইফিল আখ্য়ার।

নিশাপুর অবস্থানকালে ইমাম গাযালী (র) গ্রন্থাদি রচনা শুরু করেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের যে জড়বাদ বিশেষত গ্রীক দার্শনিকদের ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদ মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এই কালেই তিনি অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ বিচারে এই সব দোষ-ত্রুটি চালিয়া বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া মনখুল (ইহার অর্থ চালনি দ্বারা চালা) গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম জীবনের লেখা হইলেও ইহা সুধীজনের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। এমনকি, তাঁহার উস্তাদ স্বয়ং হযরত ইমামুল হারামাইন (র) পর্যন্ত এই গ্রন্থ পাঠে মন্তব্য করেন ঃ 'জীবতাবস্থায়ই তুমি আমাকে সমাধিস্থ করিলে।' অর্থাৎ ছাত্রের খ্যাতি উস্তাদের জীবদ্দশায়ই তাহার খ্যাতিকে অতিক্রম করিয়া গেল।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ইয়াহইয়াউল উলুম' ইসলাম জগতে বিশেষ সমাদৃত। সুধীজন ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় মনীষীর উক্তি এই ঃ 'জগতের সমস্ত জ্ঞান প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিলে কেবল ইয়াহ্ইয়াউল উলুম দ্বারাই উহা পুনঃরুদ্ধার করা যাইবে। ইয়াহ্ইয়ার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ জগতে আর লিখিত হয় নাই। ইয়াহ্ইয়া কুরআন শরীফের নিকটবর্তী গ্রন্থ।' জগদ্বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হযরত গাযালী (র) একদা এক বিরাট জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ আমার হাতে কোন্ গ্রন্থ তোমরা জান কি? ইহা ইয়াহ্ইয়াউল উলুম। গ্রন্থখানিকে অবজ্ঞা করার কারণে আমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে অভিযোগ করা হয়। স্বপ্নযোগে দেখিলাম, বিচারে আমার পৃষ্ঠে চাবুক মারা হইয়াছে। এই দেখ, আমার পৃষ্ঠে চাবুকের চিহ্ন বিদ্যমান।

তাঁহার রচিত 'মাকাসিদুল-ফালাসিফা', 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের কিতাব সমগ্র ইউরোপে সমাদৃত হইয়াছে এবং ইংরেজি, ফরাসী, ল্যাটিন, হিব্রু ইত্যাদি ভাষায় এইগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ইউরোপীয় বহু

বক্রপন্থী পণ্ডিতের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছে। জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন ঃ ইমাম গাযালী ও ইবনে রুশদের জন্য না হইলে মুসলমানগণ নিউটন ও এরিস্টটলের জাতি হইয়াই থাকিত। বস্তুত পাশ্চাত্যের জড়বাদী ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদের মুকাবিলায় খাঁটি দর্শনকে বলিষ্ঠ যুক্তিতে প্রকাশ করিয়া হযরত ইমাম গাযালী (র) বিশ্বামনবের মূল্যবোধ ও চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পবির্তন আনয়ন করেন। বিশেষত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়া তিনি মানবেতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

মুসলিম-বিশ্ব অপেক্ষা খ্রিষ্টান ইউরোপেই ইমাম গাযালী (র)-এর গ্রন্থাবলীর সমাদৃত বেশি। প্রখ্যাত কবি দাঁন্তে, মনীষী রেমণ্ড মার্টিন, মনীষী সেন্ট টমাস একুইনাস, প্রখ্যাত ফরাসী মিষ্টিক ব্লেইসি প্যাসকেল হযরত ইমাম গাযালী (র)-র গ্রন্থরাজি হইতেই তাঁহাদের যুক্তি ও উদাহরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মতামতকেই প্রমাণ্য বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার চল্লিশটি গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়।

'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর অপর একখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। দুনিয়ার প্রায় সকল ভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বার্ন-শহরে ল্যাটিন ভাষায় ইহা সর্বপ্রথম অনূদিত হয় এবং অধ্যাপক হিথজীন ইহার কঠিন শব্দসমূহের ভাষ্য রচনা করেন।

শোকের ছায়া

সোমবার, মাহে জামাদাল উখরা, হিজরী ৫০৫ সাল মুতাবিক ১৯ শে ডিসেম্বর, ১১১১ খ্রিস্টাব্দ। ফজরের নামায সমাপনান্তে সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়কর প্রতিভা; যুক্তি ও যুক্তিবাদী অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক, বিশ্বমানবতার দিশারী, সূফীকুল শিরোভূষণ ; হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবূ হামিদ মুহম্মদ গাযালী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ৫৫ বছর বয়সে দুনিয়াবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া রফীকে আ'লার সান্নিধ্যে উপনীত হন। সম্পূর্ণ সুস্থ দেহেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার তিরোধান সম্পর্কে তদীয় ভ্রাতা হযরত ইমাম আহ্মদ গাযালী (র) বলেন ঃ সোমবার দিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস অনুসারে ওযূ করিয়া ফজরের নামায সমাধা করেন। তৎপর পূর্বে প্রস্তুত করা তাঁহার কাফনটি চাহিয়া লইলেন এবং ইহা চোখে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, প্রভুর আদেশ শিরোধার্য। কথাটি মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়ার সাথে সাথে তিনি স্বীয় পদদ্বয় প্রসারিত করিলেন এবং সেই মুহূর্তেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিলেন।

মানবতার শেষ গতি

হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর ন্যায় ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করার জন্য রহস্যের প্রতি এমন উন্মাদনা জগতে অতি অল্প ব্যক্তির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। জীবনের সুখ-দুঃখ এবং জাগতিক সব প্রলোভনের মায়া কাটাইয়া তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানে বিমগ্ন থাকিতেন। আত্মা ও সৃষ্টিকর্তার গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার সাধনার অন্ত ছিল না। তাই এ সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা যেমনি পূর্ণাঙ্গ ও গভীর, তেমনি অভিনব। এ জ্ঞানের আলোক জগতের পথভ্রষ্ট মুসলমান আবার তাহাদের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে। তাঁহার বলিষ্ঠ যুক্তি ও অভ্রান্ত মতবাদের নিকট পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের সকল চিন্তাধারা ম্লান হইয়া পড়ে। বিগত আট শতাব্দী যাবৎ তাঁহার দর্শনই সারা জাহানের মুসলমানের দিগদর্শন যন্ত্ররূপে তাহাদের মানসিক জগতকে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে।

তাঁহার প্রতিভা ও দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বাস্তব জীবনে তাঁহার মত ও পথ অবলম্বন করিলেই বিশ্বমানবতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে, সমগ্র বিশ্বে এক ও অভিন্ন, সুন্দর ও সুষম মানব সমাজ গড়িয়া উঠিবে। মনে হয় সেই দিন খুব দূরে নহে।

২৩শে রজব, ১৩৯৬ হিজরী,
৬ই শ্রাবণ, ১৩৮৩ বাংলা।

আবদুল খালেক বি. এ. (অনার্স)
গ্রাম ও পোঃ পীরপুর
জিলা–ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

হামদ ঃ আকাশের তারকারাজি, মেঘের বিন্দু, বৃক্ষের পাতা, মরুভূমি, বালুকাকণা এবং আসমান-যমীনের পরমাণু–এই সমস্তের সমষ্টি যেমন অসীম, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাও তদ্রূপ অনন্ত অসীম। উপমাহীন একত্ব তাঁহার গুণ এবং প্রতাপ, শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব এবং প্রাধান্য তাঁহার বৈশিষ্ট্য তাঁহার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের পূর্ণতার জ্ঞান সৃষ্টজগতে কাহারও নাই। তিনি ব্যতীত তাঁহার মারিফাতের হাকীকত কেহই জানে না। বরং এই হাকীকত নির্ণয় করিতে না পরিয়া অসামর্থ্য মানিয়া লওয়াই সিদ্দীকগণের মরতবার শেষ সীমা এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারার অক্ষমতা স্বীকার করাই ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণের পক্ষে তাঁহার স্তুতিগানের শেষ সীমা। তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রথম বিদ্যুৎ-ছটা দেখিয়া হয়রান হইয়া পড়াই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির শেষ সীমা। তাঁহার অপার মহিমার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় হতভম্ব হইয়া থাকাই মুরীদ ও ধর্ম পথ-যাত্রীদের শেষ কাজ। তথাপি তাঁহার মারিফাত লাভের আশা ত্যাগ করা উচিত নহে। সে আশা ত্যাগ করার অর্থই হইল কর্ম হইতে বিরত থাকা এবং তাঁহার পূর্ণ মারিফাত লাভের দাবি করা কল্পনায় তাঁহার সাদৃশ্য নির্ধারণ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনের চেষ্টা করিলে চক্ষে ধাঁধা লাগিবে, ইহা ছাড়া চক্ষের আর কিছুই লাভ হইবে না। তাঁহার বিচিত্র বিচিত্র কারিগরি লইয়া চিন্তা করিলে অবশ্যই মারিফাত হাসিল হয় এবং ইহাই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধিলব্ধ ফল।

তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করিতে যাইয়া কাহারও এইরূপ চিন্তা করা উচিত নহে যে, তিনি কেমন করিয়া হইলেন এবং তিনি কি। অপরপক্ষে এ বিশ্বজগতের আশ্চর্য আশ্চর্য বস্তুসমূহের অস্তিত্ব কিসে হইল এবং কে করিল– এই প্রকার চিন্তা হইতে কাহারও মন যেন এক মুহূর্তও গাফিল না থাকে। তাহা হইলেও বুঝা যাইবে যে, এই সমস্তই তাঁহার অসীম কুদরতের নিদর্শন– সমস্তই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের জ্যোতি ঃ সমস্ত বিচিত্র বিচিত্র বস্তু তাঁহারই হিকমতে উৎপন্ন এবং তাঁহারই সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব–যাহা কিছু আছে তিনিই তৎসমস্তের কারণ এবং তাঁহা হইতেই সমুদয় বর্তমান আছে– আর তাঁহার অস্তিত্বের জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র।

না'ত ঃ সকল পয়গম্বরের নেতা সমস্ত বিশ্ববাসীর পথ-প্রদর্শক ও পরিচালক, বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব-রহস্যের মর্মজ্ঞ এবং তাঁহার প্রিয়তম ব্যক্তি হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ। আর তাঁহার সকল সন্তান-সন্ততি ও আসহাবের উপর দরূদ। তাঁহারা সকলেই উম্মতের নেতা এবং ধর্মপথের পথপ্রদর্শক।

মানুষের মরতবা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে খেলাধুলা ও নিরর্থক কাজের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। বরং তাহার উপর অতি শ্রেষ্ঠ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে এবং তাহার জীবনে গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। কেননা, মানুষ অনাদি না হইলেও অনন্তকাল পর্যন্ত অবশ্যই থাকিবে। তাহার মৃত্তিকা নির্মিত এবং তুচ্ছ হইলেও, উর্ধ্বজগৎ ও মহান আল্লাহ্‌র সহিত তাহার আত্মার সম্পর্ক রহিয়াছে। জীবনের প্রারম্ভে যদিও সে পশুপক্ষী ও শয়তানের ভাবসমূহে জড়িত থাকে তথাপি মুজাহাদার হাপরে তাহাকে নিক্ষেপ করিলে সকল প্রকার ভেজাল ও ময়লা হইতে পাক-পবিত্র হইয়া সে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপযোগী হইয়া উঠে। মানুষ নীচতলার গভীরতম কূপে (আস্‌ফালুস সাফেলীনে) নিমগ্ন হইতে পারে আবার সে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখর, সর্বোচ্চ ইল্লীন পর্যন্ত উপনীত হইতে পারে। পশুপক্ষী ও শয়তানের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া কাম ও ক্রোধের বশীভূত হওয়াকেই আসফালুস সাফেলীনে নিমগ্ন হওয়া বলে। অপরপক্ষে মানুষ যখন সদগুণরাজিতে বিভূষিত হইয়া ফেরেশতার সমকক্ষ হইয়া উঠে এবং কাম ও ক্রোধ হইতে অব্যাহতি লাভ করে, বরং এই রিপুদ্বয় তাহার গোলাম আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে তখনই সে সর্বোচ্চ ইল্লীনে উপনীত হয়। এই মরতবায় উন্নীত হইলেই মানুষ আল্লাহর বন্দেগীর উপযুক্ত হয়। আর ইহাই ফেরেশতাগণের সৎস্বভাব ও মানুষের মরতবার শেষ সীমা। মানুষ আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত হইলে সে এক মুহূর্তও তাঁহার দীদার ব্যতীত থাকিতে পারে না ; আর আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য দর্শনই তাহার জন্য বেহেশ্‌ত পরিণত হয়। চক্ষু, উদর ও কাম প্রবৃত্তি তৃপ্তির জন্য যে বেহেশত, তাহা তখন তাহার নিকট নিতান্ত হেয় হইয়া পড়ে।

গ্রন্থ রচনার কারণ ঃ মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই এবং হেয় পদার্থে তাহার জন্ম। তাই এই পূর্ণতা হইতে তাহাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়া কঠোর সাধনা ও আন্তরিক পীড়াসমূহের যথোপযুক্ত চিকিৎসা ব্যতিত কিছুতেই সম্ভব নহে। যে কীমিয়া (রাসায়নিক প্রক্রিয়া) দ্বারা পিতল ও তামার সংশোধন করত বহুমূল্য স্বর্ণে পরিণত করা যায় তাহা যেমন দুঃসাধ্য এবং সকলে ইহা জ্ঞাত নহে– তেমনই এই কীমিয়া (পরশমণি) যাহা মানুষের হৃদয় হইতে পশুপক্ষীর স্বভাব দূর করত ফেরেশতাগণের মর্যাদার উন্নীত করে এবং যদ্দ্বারা মানুষ চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হয় তাহাও নিতান্ত কঠিন ও সকলেই জানে না। ইহা মানুষকে শিখাইবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে ইহাই চিরস্থায়ী কীমিয়ায়ে

সাআদাত অর্থাৎ সৌভাগ্যের পরশমণি। এই জন্যেই এই গ্রন্থের নাম 'কীমিয়ায়ে সাআদাত' অর্থাৎ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' রাখা হইল এবং ইহার জন্য এই নামই অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। তামা ও স্বর্ণের মধ্যে বর্ণ ও মূল্য ব্যতীত আর কোন প্রভেদ নাই। সাধারণ পরশমণি দ্বারা দুনিয়াতে ধনবান হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য সফল হয় না এবং দুনিয়া নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। এমতাবস্থায় দুনিয়ার ধনদৌলতের মূল্যই বা কতটুকু? পশু ও ফেরেশতার স্বভাবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই পরশমণি পশুকে ফেরেশতা বানাইতে পারে। সুতরাং ইহার ফল চিরস্থায়ী সৌভাগ্য এবং ইহার পুরস্কার অপরিসীম; আর কোন প্রকার মলিনতাই উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অতএব ইহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই 'সৌভাগ্যের পরশমণি' বলা যাইতে পারে না।

সৌভাগ্যের পরশমণি কোথায় যাওয়া যায় ঃ পরশমণি যেমন কোন বৃদ্ধার পর্ণকুটীরে পাওয়া যায় না, কেবল বাদশাহের ধনভাণ্ডারে পাওয়া যাইতে পারে, তদ্রূপ চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের পরশমণি সকল স্থান পাওয়া যায় না, একমাত্র আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারেই পাওয়া যায়। আকাশে ফেরেশতাগণের আত্মা এবং জগতে পয়গম্বরগণের হৃদয় আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার। সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরের দরবার ব্যতীত অন্যত্র সৌভাগ্যের পরশমণির অনুসন্ধান করিবে সে পথভ্রান্ত ও প্রতারিত হইবে এবং তাহার সকল চেষ্টা বিফলে যাইবে। কিয়ামত দিবসে তাহার নিঃস্বতা ও অসারতা প্রকাশ পাইবে এবং দুনিয়াতে যে সে ভালকে মন্দ ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল তজ্জন্য অপমানিত হইবে সে তখন আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা শুনিতে ইহবে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "তখন আমা হইতে তোমার চক্ষের আবরণ খুলিয়া দিলাম ; অদ্য তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইল।" –(সূরা কাফ, রুকু ২, পারা ২৬)

পয়গম্বরগণ মানজাতির পথপ্রদর্শক ঃ আল্লাহ্‌র বড় বড় নিয়ামতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এই যে, উল্লেখিত পরশমণি মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছেন। কি প্রণালীতে মানবাত্মাকে মুজাহাদার হাপরে ফেরিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হয়, যে সমস্ত কুপ্রবৃত্তির কুস্বভাব ও আত্মাকে কলুষিত করিয়া ফেলে উহা কি প্রকারে বিদূরিত করিতে হয় এবং কি করিয়া সৎপ্রবৃত্তি ও সৎ-স্বভাবে দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করা যায়, এই সকল উপায় তাঁহারা মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন। আল্লাহ্ যেমন স্বীয় পবিত্রতা ও বাদশাহীর প্রশংসা করিয়াছেন তদ্রূপ পয়গম্বরগণের প্রেরণ সম্পর্কেও তিনি নিজের গুণকীর্তন করিয়াছেন এবং এইরূপে মানব জাতির অসাধারণ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ (الى قوله) لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

অর্থাৎ, "আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় সেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে, যিনি বাদশাহ, অতি পাক-প্রবল (ও) হিকমতওয়ালা ; তিনিই যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন (সেই পয়গম্বর) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট পাঠ করেন এবং তাহাদিগকে পাক করেন এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেন। অবশ্যই তাহারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।" (সূরা জুম'আ, রুকূ ১ ঃ ২ পারা ২৮)

এই আয়াতে 'তাহাদিগকে পাক করেন' বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষকে পাশবপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাব হইতে পাক করেন এবং 'তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন' বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষ কি প্রকারে ফেরেশতাগণের গুণরাজিতে বিভূষিত হইতে পারে, তাহার উপায় শিক্ষা দেন।

সৌভাগ্যের পরশমণির সূচীপত্র ঃ মানবাত্মা হইতে অনিষ্টকর দোষ ও মন্দ স্বভাব দূর করত ইহাকে উত্তম গুণরাজিতে সুসজ্জিত করাই এই পরশমণির উদ্দেশ্য। দুনিয়া হইতে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট হওয়াই ইহার প্রধান কার্য, যেমন রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ প্রথম শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً ـ

অর্থাৎ, "আপনি আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করুন এবং সব হইতে একেবারে মুখ ফিরাইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে পৃথক হইয়া আসুন।"

(সূরা মুয্‌যাম্মিল, রুকূ ১, পারা ২৯)

এই আয়াতের ভাবার্থ এই, দুনিয়ার সকল পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যথাসর্বস্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এ গ্রন্থে এই বিদ্যার অতি সংক্ষিপ্ত প্রণালী বর্ণিত হইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ বহু বিস্তৃত। গ্রন্থের ভূমিকায় চারটি বিষয়ের সম্যক পরিচয় দেওয়া হইবে এবং মূল গ্রন্থের চারিটি অংশে চারিটি বিষয় বর্ণিত হইবে ও প্রতিটি অংশ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইবে। ভূমিকার চারটি বিষয় চারি অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। প্রথম ঃ আপনার পরিচয় বা আত্মদর্শন; দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ্‌র পরিচয় বা তত্ত্বদর্শন ; তৃতীয় ঃ দুনিয়ার পরিচয় বা দুনিয়া দর্শন ও চতুর্থ ঃ পরকালের পরিচয় বা পরলোক দর্শন (এই চারিটি বিষয় দর্শন পুস্তকে বর্ণিত হইবে)। এই চারিটি জ্ঞান বাস্তবপক্ষে মুসলমানী জ্ঞানের সূচনা। মুসলমানী কার্যকলাপ চারিটি প্রধান অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে দুইটি বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত অপর দুইটি হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে। বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দুইটি এই ঃ (১) আল্লাহ্‌র আদেশ

পালন। ইহাকে ইবাদত বলে। (২) গতি, স্থিতি ও জীবিকা অর্জন প্রভৃতি যথানিয়মে নির্বাহ করা। ইহাকে মুআমালা বা সামাজিক ব্যবহার বলে। হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিষয়দ্বয় এই ঃ (১) মন্দ স্বভাব হইতে হৃদয়কে পাক করা ; যেমন ক্রোধ, কৃপণতা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মভিমান ইত্যাদি মানব চরিত্র ধ্বংস করে এবং মানুষকে ধর্মপথ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। (২) আত্মসংশোধন করত সৎস্বভাব অর্জন; যেমন ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ্‌র মহব্বত, আশা, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি মানবের পরিত্রাণকারী গুণ।

মূল গ্রন্থের চারি খণ্ডের বিষয়সূচী এই

প্রথম খণ্ড ঃ ইবাদত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইবাদত–খণ্ডে দশ অধ্যায়ে লিখিত হইবে। প্রথম ঃ সুন্নত জামাতভুক্ত মুসলমানগণের ধর্মবিশ্বাস। দ্বিতীয় ঃ বিদ্যাশিক্ষা। তৃতীয় ঃ শারীরিক পবিত্রতা। চতুর্থ ঃ নামায। পঞ্চম ঃ যাকাত। ষষ্ঠ ঃ রোযা। সপ্তম ঃ কুরআন শরীফ পাঠ। নবমঃ যিকির ও দু'আ। দশম ঃ অযীফার নিয়ম।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ব্যবহার। ইহারও দশটি অধ্যায় হইবে। প্রথম ঃ পানাহার। দ্বিতীয়ঃ বিবাহ। তৃতীয় ঃ জীবিকা অর্জন ও ব্যবসায়। চতুর্থ ঃ হালাল বিষয় নির্বাচন। পঞ্চম ঃ সংসর্গের নিয়ম। ষষ্ঠ ঃ নির্জন বাসের নিয়ম। সপ্তম ঃ বিদেশ ভ্রমণ। অষ্টম ঃ সংগীত। নবম ঃ সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ। দশম ঃ রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন।

তৃতীয় খণ্ড ঃ বিনাশন। ইহাও দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ঃ চরিত্র সংশোধনের সাধনা ও কুস্বভাবে দূর করিবার উপায়। দ্বিতীয় ঃ ভোজন-লিপ্সা ও কামরিপু। তৃতীয়ঃ বাহুল্য কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ। চতুর্থ ঃ ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়। পঞ্চম ঃ সাংসারাসক্তি ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়। ষষ্ঠ ঃ ধনাসক্তি, কৃপণতা এবং দানশীলতা। সপ্তম ঃ সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ। অষ্টম ঃ রিয়া ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়। নবম ঃ অহংকার ও আত্মগর্ব। দশম ঃ উদাসীনতা, অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার।

চতুর্থ খণ্ড ঃ পরিত্রাণ। ইহারও দশটি অধ্যায়। প্রথম ঃ তওবা। দ্বিতীয় ঃ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা। তৃতীয় ঃ ভয় ও আশা। চতুর্থ ঃ অভাবগ্রস্থতা ও সংসারবিরাগ। পঞ্চম ঃ নিয়ত, সিদ্‌ক ও ইখলাস। ষষ্ঠ ঃ মুরাকাবা ও মুহাসাবা। সপ্তম ঃ তাফাক্কুর। অষ্টম ঃ তাওহীদ। নবম ঃ আল্লাহ্‌র মহব্বত। দশম ঃ মৃত্যুর অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা।

উল্লেখিত বিষয়গুলি 'সৌভাগ্যের পরশমণি'র সূচীপত্র। আমরা এই মূল গ্রন্থের ভূমিকায় (অর্থাৎ দর্শন পুস্তকে) চতুর্বিধ দর্শন এবং পরবর্তী চারি খণ্ডে চল্লিশ অধ্যায়ে চতুর্বিদ অনুষ্ঠানের বর্ণনা করিব। সাধারণ লোকের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে লেখনীকে সূক্ষ্মভাবে ও কঠিন ভাষা হইতে বিরত রাখিব। কাহারও এ বিষয়ে

বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুমিদ্দীন' 'জাওয়াহেরুল কুরআন' বা এ বিষয়ে লিখিত অপর বড় বড় কিতাবাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞানের কথা বুঝাইবার উদ্দেশ্য তাহাদের প্রার্থনা অনুযায়ী তাহাদের সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় ইহা লিখিত হইল।

প্রার্থনা ঃ তাহাদের সেই নিয়ত ও গ্রন্থ প্রণয়নে আমার সংকল্প যেন আল্লাহ্ পাক-সাফ রাখেন। আমাদের উদ্দেশ্য তিনি রিয়া ও মলিনতা হইতে নির্মল রাখুন এবং আমাদেগকে তাঁহার অনুগ্রহের প্রত্যাশী করিয়া লউন। পুণ্যের পথ আমাদের জন্য তিনি খুলিয়া দিন এবং যাহা বলিব তদনুযায়ী যেন আমল করিতে পারি, তিনি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করুন। কারণ, যাহা করা হইবে না তাহা বলা বৃথা এবং উপদেশ দিয়া তদনুযায়ী আমল না করিলে পরকালে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। তদ্রূপ কার্য হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রথম অধ্যায়

আপনার পরিচয় বা আত্মদর্শন

আত্মদর্শনের উদ্দেশ্য ঃ আত্মজ্ঞানই আল্লাহ্-জ্ঞানের কুঞ্জী এই জন্যই বুযুর্গগণ বলেন ঃ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ ـ

অর্থাৎ "যিনি নিজকে চিনিয়াছেন তিনি আল্লাহ্কে চিনিয়াছেন।"

আল্লাহ্ও এই কারণেই বলেন ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِى اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ

অর্থাৎ, "শীঘ্র আমি তাহাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ পৃথিবীতে ও তাহাদের নিজের মধ্যে দেখাইয়া দিব যতক্ষণ না তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য।" – সূরা হামীম আস-সাজদা, রুকূ ৬, পারা ২৪

আত্মদর্শনের স্বরূপ ঃ জগতে তোমার নিজ দেহ যেমন তোমার নিকটবর্তী অন্য কোন বস্তু তোমার তত নিকটবর্তী নহে। ইহাতেও যদি তুমি নিজেকে চিনিতে না পার তবে অন্যান্য বস্তু কিরূপে চিনিতে পারিবে? তুমি যদি বল, "আমি আমাকে বেশ চিনি", তবে ইহা ভুল। কারণ, এরূপ আত্মজ্ঞান আল্লাহ্র মারিফাতের কুঞ্জী হইতে পারে না। এরূপ জ্ঞান পশুদেরও আছে। তুমি যেমন তোমার বাহ্য হস্ত, পদ, মুখ, মস্তক ও মাংসপেশীর অধিক আর কিছুই চিন না এবং তোমার আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে শুধু এতটুকু বুঝিতে পার যে, ক্ষুধা পাইলে আহার কর, কামভাব প্রবল হইলে স্ত্রী সহবাস কর, পশুগণও ঠিক তদ্রূপই করিয়া থাকে। তোমার হাকীকত জানা তোমার উচিত। তুমি কি? কোথা হইতে আসিলে? কোথায় যাইবে? দুনিয়াতে কেন আসিলে? তোমাকে কি জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে? তোমার সৌভাগ্য কি এবং কিসে ইহা নিহিত রহিয়াছে? তোমার দুর্ভাগ্য কি এবং কিসে ইহা লুক্কায়িত আছে? তোমার মধ্যে যে সমস্ত গুণ আছে তন্মধ্যে কতকগুলি গুণ চতুষ্পদ জন্তুর, কতকগুলি হিংস্র প্রাণীর, কতকগুলি শয়তানের, আর কতকগুলি ফেরেশতার। এই সকল গুণের মধ্যে কোন্গুলি

এবং কি কি তোমার আসল ও স্বাভাবিক অবস্থায় অনুরূপ? আর কোন্ কোন্গুলি অন্য কারণে উৎপন্ন এবং এইগুলি কোন্ ধরনের? যতদিন তুমি এই সকল বিষয় না জানিবে ততদিন তুমি স্বীয় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে না।

পাশব ও ফেরেশতা প্রকৃতি ঃ ঐ সকলের প্রত্যেকেরই জীবিকা ও উন্নতি পৃথক পৃথক। পানাহার, নিদ্রা ও সহবাস দ্বারা ইতর প্রাণীর শরীর পোষণ হয়। শরীর মোটাতাজা ও বলবান হইলেই ইহাদের উন্নতি হইল এবং ইহা তাহাদের সৌভাগ্য। তুমি ইতর প্রাণী হইয়া থাকিলে দিবারাত্র উদর পূরণ ও কাম-রিপুর তোষণে রত থাক। মারামারি করা, হত্যা করা ও বিবাদ-বিসম্বাদ করা হিংস্র জন্তুর স্বভাব। অনিষ্টকারিতা, প্রতারণা ও বাহানা শয়তানের প্রকৃতি। তুমি হিংস্র জন্তু বা শয়তান হইয়া থাকিলে ঐ সকল নিকৃষ্ট কার্যে লিপ্ত হও। তাহা হইলে তুমি স্বীয় পাশব প্রবৃত্তি ও শয়তানী স্বভাব পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়া আরাম পাইবে এবং পশু ও শয়তান যাহাকে সৌভাগ্য মনে করে তদ্রূপ সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবে। আল্লাহ্র অপার সৌন্দর্য দর্শনই ফেরেশতাগণের উপজীবিকা ও এই সৌন্দর্য দর্শন করিয়াই তাঁহারা সৌভাগ্যবান। পাশব প্রবৃত্তি ও শয়তানী স্বভাবের কিছুই তাহাদের মধ্যে নেই। যদি তুমি ফেরেশতাদের প্রকৃতি পাইয়া থাক তবে তদ্রূপ কার্যে রত থাক। তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্কে চিনিতে পারিবে, তাহার সৌন্দর্য দেখিবার পথ পাইবে এবং নিজকে কাম ও ক্রোধের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

মানুষের পশুর প্রকৃতি দিবার উদ্দেশ্য ঃ তোমাকে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণীর স্বভাব কেন দেওয়া হইয়াছে, এ কথা ভালরূপে বুঝিয়া না উঠা পর্যন্ত তুমি চিন্তা করিতে থাক। এইজন্য কি দেওয়া হইয়াছে যে, সেই সকল প্রবৃত্তি তোমাকে অধীন করিয়া দিবারাত্র বিনা মজুরীতে দাসত্বে নিযুক্ত রাখিবে? বরং এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাদিগকে তুমি সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া রাখিবে এবং পরকালের যে সফরে তুমি প্রবৃত্ত রহিয়াছ ইহার সহায়করূপে তোমার তাবেদার গোলাম বানাইয়া লইবে–একটিকে বাহন ও অপরটিকে হাতিয়ার বানাইবে এবং যতদিন তুমি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ততদিন ঐ সকল প্রবৃত্তিকে নিজ কর্মে নিযুক্ত রাখিয়া উহাদের সাহায্যে সৌভাগ্যের বীজ সংগ্রহ করিয়া লইবে। তুমি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহকে চড়িবার ঘোড়া বানাইয়া জানুদ্বয়ের মধ্যে দাবাইয়া রাখিয়া সৌভাগ্যের উন্নত স্থান লক্ষ্য করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে। বুযুর্গগণ এই উন্নত স্থানকে 'আল্লাহ্র সান্নিধ্য' বলিয়া থাকেন এবং সাধারণ লোকে ইহাকে বেহেশত বলে। উপরে যাহা বলা হইল তাহা বুঝিতে পারিলে তুমি নিজের হাকীকত জানিতে পারিবে। যে ব্যক্তি এই সকল বিষয় বুঝিতে না পারে, ধর্ম-কর্ম তাহার নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। ধর্মের মূলতত্ত্ব হইতে সে বহুদূরে পর্দার অন্তরালে পড়িয়া থাকে।

মানব সৃজনের দ্বিবিধ উপকরণ ঃ তুমি নিজকে জানিতে চাহিলে অবগত হও যে, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিবিধ পদার্থে সৃজন করিয়াছেন। প্রথম–এই বাহ্য দেহ যাহা চর্মচক্ষে দেখা যায় ; দ্বিতীয়–রূহ বা আত্মা যাহাকে একমাত্র বাতেনী চক্ষু দেখিতে পারে, উহা চর্মচক্ষের অগোচর।

আত্মা ঃ মানুষের এই আভ্যন্তরিক বস্তুই 'তুমি'। ইহা ব্যতীত আর যতকিছু তোমার সহিত আছে তৎসমুদয়ই উহার অধীন– খালেদ ও লস্কর। আমরা এই আভ্যন্তরীণ মূল বস্তুকে 'দিল' বলিব। যখন এই গ্রন্থে 'দিল' শব্দের প্রয়োগ হইবে তখন মানবের সেই মূল বস্তু আত্মাকেই বুঝাইবে। উহাকে কখন 'রূহ' আবার কখন 'নফস'ও বলা হইবে। মানুষের বক্ষস্থলের ভিতরে বাম পার্শ্বে যে এক টুকরা গোশ্ত আছে, এ গ্রন্থে 'দিল' শব্দে তাহাকে লক্ষ্য করা হইবে না। এই গোশ্তখণ্ডের মূল্যই বা কি? ইহা তো পশুদেরও আছে এবং মৃতদেহেও থাকে। মানুষের মূল বস্তু দিল বা আত্মা এই চর্মচক্ষে দেখা যায় না। যাহা চর্মচক্ষে দেখা যায় তাহা জড়জগতের অন্তর্গত। আত্মা জড়জগতের পদার্থ নহে; তবে এ জগতে মুসাফিরের ন্যায় আসিয়াছে। ঐ গোশ্তখণ্ড অর্থাৎ হৃদপিণ্ড ইহার বাহন ও হাতিয়ার এবং শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যক্ষ ইহার লস্কার এবং ইহা সমস্ত শরীরের অপ্রতিহত বাদশাহ। আল্লাহ্র মারিফাত লাভ ও তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্যদর্শনই এই আত্মার স্বভাব। ইহার উপরই ইবাদতের দায়িত্বভার রহিয়াছে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আদেশ-নিষেধ প্রচারিত হইয়াছে। পাপ-পুণ্যের ফল ইহাকেই ভোগ করিতে হইবে। ইহার অদৃষ্টেই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ধারিত আছে। এ সকল বিষয়ে শরীর আত্মার অধীন। আত্মার স্বভাব ও হাকীকত জানাই আল্লাহ্র মারিফাতের কুঞ্জী। আত্মাকে চিনিতে চেষ্টা কর। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রত্ন এবং এই রত্ন ফেরেশতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র দরবার ইহার উৎপত্তি স্থান। ইহা আল্লাহ্র দরবারেই ফিরিয়া যাইবে। আত্মা এ জগতে মুসাফিরের ন্যায় বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের জন্য আগমন করিয়াছে। এই বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের অর্থ ইনশাআল্লাহ্ পরে বর্ণিত হইবে।

আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে না পারা পর্যন্ত তুমি ইহার হাকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) জানিতে পারিবে না। প্রথমে ইহার অস্তিত্ব বুঝিয়া লও, তৎপর ইহার হাকীকত অবগত হইও যে ইহা কি জিনিস। অবশেষে আত্মার সহিত ইহার লস্করের কি সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝিয়া লও। পরিশেষে আত্মার কোন্ কোন্ গুণের প্রভাবে আল্লাহ্র মারিফাত এবং ইহা হইতে কিরূপে সৌভাগ্য লাভ করা যায় জানিয়া লও। এই সকল প্রশ্নের উত্তর পরে দেওয়া হইবে।

আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ ঃ আত্মার অস্তিত্ব তো সুস্পষ্ট। কারণ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহ্য শরীরের অস্তিত্ব দ্বারা মানবের অস্তিত্বের

প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, মৃত ব্যক্তিরও শরীর থাকে, কেবল প্রাণ থাকে না। আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিলে শরীর শবে পরিণত হয়। কেহ যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কল্পনাবলে নিজ দেহ, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সব ভুলিয়া যায় তবে নিজ অস্তিত্ব সে অবশ্যই বুঝিতে পারিবে। সে ব্যক্তি স্বকীয় দেহ, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সব ভুলিয়া গেলেও নিজে যে বর্তমান আছে তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ থাকিবে না। এই প্রকারে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে পরকাল সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান লাভ হইতে পারে। স্বীয় দেহ ও বহির্জগত ভুলিয়া গেলেও যখন আমাদের অস্তিত্ব থাকে তখন মৃত্যু ঘটনায় আমাদের শরীর কাড়িয়া লইলেও আমাদের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, অর্থাৎ আমাদের আত্মা স্থায়ী থাকিবে, কখনও ধ্বংস হইবে না।

আত্মার পরিচয় ঃ আত্মা কি জিনিস এবং উহার স্বাভাবিক গুণ কি, বর্ণনা করিবার অনুমতি শরীয়তে নাই। এই জন্যই রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মার ব্যাখ্যা করেন নাই। আত্মা সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

অর্থাৎ. 'আর লোকে আপনাকে আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলুন– আত্মা আমার প্রভুর হুকুম।"

আত্মা আল্লাহ্র সৃষ্ট এবং আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত। ইহার অধিক বলার অনুমতি নাই। আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ -

অর্থাৎ "অবগত হও, সৃষ্টি ও হুকুম করার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে।"

আলমে খাল্ক ও আলমে আম্র দুইটি স্বতন্ত্র জগত। যে সলক বস্তুর দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা এবং সংখ্যা আছে উহাকে আলমে খাল্ক (জড়জগত) বলে। এই জন্য আরবী অভিধানে খাল্ক শব্দের অর্থ আন্দাজ বা পরিমাপ করা লিখিত আছে। আত্মার আকার বা পরিমাপ নাই এবং এইজন্যই ইহাকে ভাগ করা যায় না। আত্মা যদি ভাগ করার উপযুক্ত হইত তবে ইহার এক অংশে কোন পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিত এবং অপর অংশ এই সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত। তাহা হইলে আত্মা একই সময়ে একই বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞ উভয়ই হইত। কিন্তু এরূপ হওয়া অসম্ভব। আত্মা বিভাজ্য নহে এবং ইহা পরিমাপেরও যোগ্য নহে ; অথচ আত্মা সৃষ্ট পদার্থ–আল্লাহ ইহাকে সৃজন করিয়াছেন। 'খাল্ক' শব্দের অর্থ যেমন সৃজন করা তদ্রূপ ইহার অপর অর্থ আন্দাজ বা পরিমাপ করা। প্রথম অর্থে আত্মা আলমে খাল্কের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় অর্থে ইহা আলমে খালকের অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং আলমে আম্রের অন্তর্গত। যে সকল বস্তুর

আকার নাই, পরিমাণ নাই এবং বিভক্ত হইতে পারে না, তৎসমুদয় আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত।

আত্মা অনাদি নহে। যাঁহারা ইহাকে অনাদি বলিয়া মনে করেন তাহারা ভুল করিয়াছেন। আবার যাঁহারা আত্মাকে 'আরয' বা গুণপদার্থ বলেন তাঁহারাও ভ্রমে পড়িয়াছেন। কারণ, গুণ পদার্থ স্বয়ং বিদ্যমান থাকিতে পারে না–গুণাধার পদার্থের আশ্রয়ে অবস্থান করে। আত্মা যখন মানুষের আসল জিনিস এবং সমস্ত দেহ ইহার অধীন তখন আত্মা কিরূপে গুণপদার্থ হইতে পারে? আবার যাঁহারা আত্মাকে সাকার বা শরীরী বস্তু বলেন তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কেননা, শরীরের অংশ হইতে পারে ; কিন্তু আত্মা বিভক্ত হইতে পারে না।

জীবাত্মা বা পরমাত্মা ঃ উপরে যে রূহ বা আত্মার পরিচয় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন মানুষের মধ্যে অপর একটি রূহ আছে। ইহাকে জীবন বলে। ইহা বিভক্ত হইতে পারে এবং ইহা পশুপক্ষীরও থাকে। কিন্তু আমরা যাহাকে রূহ বা আত্মা বলিলাম তাহাই আল্লাহ্র মারিফাতের স্থান। পশুপক্ষীর দেহে ইহা বিদ্যমান নাই। ইহা দেহবিশিষ্ট নহে, গুণ পদার্থও নহে; বরং ইহা ফেরেশতাগণের সমজাতীয় এক মৌলিক পদার্থ। ইহার হাকীকত অবগত বড় কঠিন।

আত্মার হাকীকত জানিবার প্রারম্ভের কর্তব্য ঃ আত্মার ব্যাখ্যা করা এবং যাহারা সবেমাত্র ধর্মপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আত্মার হাকীকত জানিবার তাহাদিগের কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ, ধর্ম-পথ যাত্রীর প্রথম কর্তব্য হইল রিয়াযত মুজাহাদা (কঠোর সাধনা) এবং যে ব্যক্তি যথারীতি রিয়াযত মুজাহাদা করিবে তাহার নিকট আপনা-আপনি আত্মার স্বরূপ খুলিয়া যাইবে। আত্মার পরিচয় লাভের পথ আল্লাহ্ই তাহার সম্মুখে খুলিয়া দিয়া থাকেন, যেমন তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

অর্থাৎ "আর যাহারা আমার জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে আমার রাস্তা দেখাইব।" –সূরা আনকাবূত, রুকু ৭

যে ব্যক্তি রিয়াযত-মুজাহাদার সকল সোপান অতিক্রম করে নাই তাহার নিকট আত্মার হাকীকত বর্ণনা করিবার অনুমতি নাই। কিন্তু রিয়াযতের পূর্বে আত্মার সৈন্যগুলি চিনিয়া লওয়া উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি আপন সৈন্যের খবর রাখে না সে আবার যুদ্ধ করিবে কিরূপে?

মানবদেহ আত্মার রাজ্য ঃ মানবদেহ আত্মার রাজ্য এবং এই রাজ্যে আত্মার বিভিন্ন প্রকারের সৈন্য আছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ -

অর্থাৎ ঃ 'আর তিনি ব্যতীত প্রভুর সৈন্য সম্বন্ধে কেহই জানে না।'

–সূরা মুদ্‌দাসসির, রুকু ১

এই আয়াতে দেহ রাজ্যের সৈন্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আত্মা পরকালের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং স্বীয় সৌভাগ্য অনুসন্ধান করা ইহার কার্য। আল্লাহ্ মারিফাত লাভই আত্মার সৌভাগ্য। আবার স্বাভাবিক গুণ দ্বারাই আল্লাহ্‌র মারিফাত লাভ হয় এবং এই সমস্ত কেবল অনুভব করা চলে (জড়জগতের বস্তুর ন্যায় স্পর্শ করা যায় না)। আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা যায়। শরীরে এই সকল ইন্দ্রিয় অবস্থান করে। আত্মা যেন শিকারী, মারিফাত তাহার শিকার এবং ইন্দ্রিয় তাহার ফাঁদ। দেহ আত্মার বাহন এবং ইহার ফাঁদ ও হাতিয়ারসমূহ বহন করিয়া চলে। এই কারণেই আত্মার জন্য দেহের আবশ্যক হইয়াছে।

দেহরক্ষী সৈন্য ঃ উষ্ণতা, পানি, বাতাস এবং মাটি মিলিত হইয়া মানব দেহ সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্যই শরীর দুর্বল। অভ্যন্তরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং বাহিরে পানি, আগুন, হিংস্র জন্তু ও শত্রুর অত্যাচারে মানবদেহ ধ্বংস হইতে পারে। সুতরাং ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাহার পানাহারের প্রয়োজন হইয়াছে এবং তজ্জন্য আত্মার দুই প্রকার সৈন্যেরও আবশ্যক হইয়াছে। প্রথম-প্রকাশ্য সৈন্য, যেমন–হস্ত, পদ, দন্ত, মুখ, পাকস্থলী ইত্যাদি। দ্বিতীয়– আভ্যন্তরিক সৈন্য, যেমন–পানাহার ইচ্ছা। আবার বাহিরের শত্রু দমনের জন্য দুই প্রকার সৈন্যের আবশ্যক। প্রথম, বাহিরের সৈন্য, যেমন–হস্ত, পদ ও অস্ত্রশস্ত্র। দ্বিতীয়, ভিতরের সৈন্য। যেমন– কামনা, ক্রোধ ইত্যাদি। যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তাহা আত্মারই প্রকার ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। তন্মধ্যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় বাহিরের, যথা–দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভিতরের, যথা– খেয়াল, চিন্তা, স্মরণ, কল্পনা, অনুধ্যান– এই পাঁচ শক্তি মস্তিষ্কের পাঁচ ইন্দ্রিয়। এই শক্তিসমূহের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক কার্য নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে একটি দুর্বল বা ধ্বংস হইলে মানুষের সাংসারিক কার্য ও ধর্ম কর্মে ব্যাঘাত ঘটে।

দেহরক্ষী সৈন্য আত্মার অধীন ঃ উপরে যে সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৈন্যের উল্লেখ হইল তৎসমুদয়ই আবার আজ্ঞাধীন। আত্মা সেই সকলের বাদশাহ। আত্মার আদেশক্রমেই জিহ্বার আদেশক্রমেই জিহ্বা কথা বলে, হস্ত ধারণ করে, পথ চলে, চক্ষু দর্শন করে এবং চিন্তাশক্তি চিন্তা করে। উহাদের সম্মতি ও ইচ্ছা অনুসারেই আল্লাহ্ উহাদিগকে আবার আজ্ঞাধীন করিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, উহারা শরীরের

হেফাজত করিবে যাহাতে আত্মা ঐ শক্তির সাহায্যে স্বীয় পাথেয় সংগ্রহ করিতে ও শিকার ধরিয়া লইতে পারে এবং পরকালের বাণিজ্য পূর্ণ করিয়া লইতে ও সৌভাগ্যের বীজ বপন করিতে পারে। ফেরেশতাগণ যেমন, আনন্দের সহিত আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে এবং কখনই আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে না, ঐ সকল সৈন্যও তদ্রূপ আত্মার আদেশ পালন করিয়া থাকে।

শরীর, আত্মা ও তাহার সৈন্যদের তুলনামূলক পরিচয় ঃ আত্মার সমস্ত সৈন্যের পরিচয় বহু বিস্তৃত। তথাপি মোটামুটি বুঝাইবার জন্য একটি উপমা দেওয়া যাইতেছে। শরীর যেন একটি শহর; হস্ত-পদ ইত্যাদি প্রত্যেকে এক একটি ব্যবসায়ী। লোভ এই শহরের খাজনা আদায়কারী তহশীলদার; ক্রোধ কোতওয়াল; আত্মা বাদশাহ এবং বুদ্ধি উযীর। আপন রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে বাদশাহের ঐসকল কর্মচারীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তহশীলদার লোভ, বড় মিথ্যাবাদী এবং স্বীয় অধিকারের অতিরিক্ত কর্ম করিয়া বসেও বুদ্ধিরূপ উযীরের আদেশ অমান্য করে। সে রাজস্বের বাহানায় রাজ্যের সকল ধন সর্বদা আত্মসাৎ করিয়া লইতে চায়। কোতওয়াল ক্রোধ বড় দুষ্ট, বদমেজাজ ও তেজীয়ান। খুন-জখম করিতে সে বড় ভালবাসে। অপরাপর বাদশাহ যেমন সব কার্যে স্বীয় মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করেন, মিথ্যাবাদী ও লোভী তহশীলদারগণকে কানমলা দিয়া সোজা করিয়া রাখেন, মন্ত্রীর পরামর্শের বিপরীত তাহাদের কোন কথাই শ্রবণ করেন না, দুষ্ট সীমা অতিক্রমকারীদিগকে দমন রাখবার জন্য কোতওয়াল নিযুক্ত করেন, আবার কোতওয়ালকেও দমন রাখেন, আইনের বাহিরে একপদও যাইতে দেন না এবং সর্বপ্রকার রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন, তদ্রূপ আত্মারূপ বাদশাহ্‌র স্বীয় দেহ রাজ্যের শাসনকার্যে বুদ্ধিরূপ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিলে এবং লোভ ও ক্রোধকে দমন করত উহাদিগকে বুদ্ধির অধীন করিয়া রাখিলে এইরূপ শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ হইলে আত্মা সৌভাগ্যের পথে চলিয়া নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। অপর পক্ষে ক্রোধ ও লোভ যদি বুদ্ধিকে বন্দী করিয়া গোলাম বানাইয়া রাখে তবে দেহ-রাজ্য ও হতভাগ্য বাদশাহ উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা গেল যে, দেহরক্ষার জন্য আল্লাহ্ ক্রোধ ও লোভ সৃষ্টি করিয়াছেন। পানাহার গ্রহণ করিয়া দেহরক্ষার জন্য লোভের সৃষ্টি এবং শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্রোধের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রোধ ও লোভ দুইটিই শরীরের খেদমতগার। পানাহার শরীরের খোরাক। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বহন করিবার জন্য শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং শরীর এই সকল ইন্দ্রিয়ের খাদেম। আবার আত্মার পক্ষে প্রদীপের কার্য করিবে বলিয়া বুদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে যেন এই প্রদীপের আলোকে আত্মা আল্লাহ্‌র মহান দরবার দর্শন করিতে পারে। ইহাই আত্মার জন্য

বেহেশত। এই হিসাবে বুদ্ধি আবার আত্মার খাদেম। আল্লাহ্‌র অনুপম সৌন্দর্য দর্শনের জন্যই আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে। আত্মা যখন আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য দর্শনে একেবারে বিভোর হইয়া পড়ে তখন সে তাঁহার উপযুক্ত বান্দা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ "আর একমাত্র আমার ইবাদত করিবার জন্যই জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া এই রাজ্য, সৈন্য ও দেহরূপ বাহন এইজন্য প্রদান করা হইয়াছে যে, ইহা জড়জগত হইতে সর্বোচ্চ ইল্লীন পর্যন্ত আরোহণ করিবে। কেহ যদি এই মহাদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বন্দেগীর কর্তব্য পালন করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে বাদশাহের ন্যায় স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক একমাত্র আল্লাহ্‌কে তাহার লক্ষ্যস্থল ও কিবলা করিয়া লইতে হইবে এবং পরকালকে আপন স্থায়ী বাসস্থান ও দুনিয়াকে পান্থশালা বিবেচনা করিতে হইবে। তৎপর শরীরকে বাহন, হস্ত পদকে খেদমতগার, বুদ্ধিকে উযীর, লোভকে ধন-রক্ষক, ক্রোধকে কোতওয়াল এবং ইন্দ্রিয়গণকে গুপ্তচর বানাইয়া প্রত্যেককে পরজগতের সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত রাখা কর্তব্য। মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে যে চিন্তাশক্তি আছে ইহা সংবাদ সংগ্রহকারী চরগণের অধিনায়ক এবং চরগণ প্রত্যেকটি সংবাদ এই অধিনায়কের নিকট উপস্থিত করে তাহার পর মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে যে স্মরণশক্তি আছে তাহা ঐ সংগৃহীত সংবাদসমূহের রক্ষক এবং সে উহা অধিনায়ক চিন্তাশক্তির নিকট হইতে লইয়া হিফাজতে রাখে ও উপযুক্ত সময়ে বুদ্ধি রূপে উযীরের নিকট পেশ করে। এইরূপ সংগৃহীত সংবাদ অনুসারে উযীর দেহ- রাজ্যের কার্য পরিচালনা করে এবং বাদশাহের পরকাল-সফরের উপায় অবলম্বনে তৎপর থাকে। উযীর যদি দেখিতে পায় যে, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পরিচালকদের মধ্যে কেহ বাদশাহের বিদ্রোহী হইয়াছে, অধীনতা বর্জন করিয়াছে ও ডাকাতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তবে বুদ্ধিরূপ উযীর তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাদিগকে অধীন করিয়া লইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করে না। কারণ, উহাদের অভাবে দেহ-রাজ্যের কার্য কখনও সুচারুরূপে চলে না। এইজন্য নানা উপায়ে উহাদিগকে এমনভাবে বশীভূত করে উহারা যেন আত্মার গন্তব্যপথে রন্ধ ও সাহায্যকারী হয়। শত্রু না হয়ে বরং মিত্রের ন্যায় সঙ্গী থাকে, চুরি ডাকাতি না করে। এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিলে আত্মা সৌভাগ্যবান হয়, আল্লাহ্ প্রদত্ত অসীম অনুগ্রহের হক আদায় করিবার উপযোগী হইয়া উঠে এবং তাহার বন্দেগী করিয়া তৎপরিবর্তে উপযুক্ত সময়ে আল্লাহ্‌র নিকট মহা পুরস্কার পাইয়া থাকে। অপরপক্ষে উক্তরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া

উহার বিপরীত কাজ করিতে আত্মা বিদ্রোহী, ডাকাত ও শত্রুদলের সহিত মিলিত হইয়া নিমকহারাম ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে তাহাকে এই গর্হিত কার্যের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

মানব প্রকৃতিতে চতুর্বিধ স্বভাব

মানবের আভ্যন্তরিক প্রত্যেক লস্করের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে এবং এইজন্যই মানবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও পৃথক পৃথক স্বভাব উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি মন্দ–ইহারা মানবকে ধ্বংস করে; আর কতকগুলি ভাল–এইগুলি মানুষকে সৌভাগ্যের উন্নত সোপানে লইয়া গিয়া মহা সম্মান প্রদান করে। এই সমস্ত স্বভাব যদিও বহুবিধ তথাপি উহাদিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা ঃ (১) চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব, (২) হিংস্র জন্তুর স্বভাব, (৩) শয়তানের স্বভাব ও (৪) ফেরেশতার স্বভাব।

মানুষের মধ্যে লোভ ও কামপ্রবৃত্তি আছে বলিয়া তাহার আহার গ্রহণ ও স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি নিকৃষ্ট জন্তুর কাজে প্রবৃও হয়, ক্রোধ আছে বলিয়া তাহার কুকুর, সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ, গালিগালাজ করিয়া থাকে। ছলনা-প্রতারণা ও অপরের সঙ্গে বিবাদ- বিসম্বাদের প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছে বলিয়াই তাহারা শয়তানের কাজ করে। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি আছে বলিয়া তাহারা ফেরেশতার কাজও করিয়া থাকে, যেমন–জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ,মন্দ কার্যে বিরাগ, অপরের মঙ্গল কামনা, জঘন্য কার্য হইতে বিরত থাকিয়া নিজ সম্মান রক্ষা করা, আল্লাহর মারিফাত লাভ করত সন্তুষ্ট হওয়া এবং অজ্ঞানতা ও মুর্খতাকে লজ্জাকর বিবেচনা করা।

বাস্তব পক্ষে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে কুকুর স্বভাব, শূকর স্বভাব, শয়তান–স্বভাব ও ফেরেশতা স্বভাব–এই চারিপ্রকার স্বভাব বিদ্যমান আছে। কুকুর স্বীয় আকৃতি, হস্ত, পদ ও চর্মের জন্য সে মন্দ–কুকুর মানুষ দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করিয়া আক্রমণ করিতে যায়। শূকরও আপন গঠনের দোষে ঘৃণিত। কুকুর ও শূকরের আত্মা যে নীচ ইহাই তাহার মূল কথা। মানুষের মধ্যেও ঐ দুই প্রকার প্রবৃত্তি বর্তমান আছে। এইরূপে মানুষের মধ্যে শয়তান স্বভাব এবং ফেরেশতা স্বভাবের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বুদ্ধির আলোকে ফেরেশতাদের জ্যোতি ঃ ইহার সাহায্যে শয়তানের ছল-চাতুরি ধরিয়া ফেলিবার জন্য মানুষকে আদেশ করা হইয়াছে। তাহা করিলেই মানুষ অপদস্থ হইবে না এবং শয়তানও তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না এই মর্মেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "প্রত্যেক মানুষের জন্য এক একটি শয়তান আছে। কিন্তু আল্লাহ তাহার উপর আমাকে জয়ী করিয়াছেন এবং সে আমার অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আর সে আমাকে মন্দ কার্যের নির্দেশ দিতে পারে না।"

খাহেশরূপ শূকর ও ক্রোধরূপ কুকুরকে দমন করিয়া এইরূপ বুদ্ধির অধীনে স্থাপন করিবার জন্য মানুষ আদিষ্ট হইয়াছে যেন উহারা বুদ্ধির আদেশ ব্যতীত চলিতে ফিরিতে না পারে। যে ব্যক্তি খায়েশ ও ক্রোধকে বুদ্ধির অধীন করিবে সে সৌভাগ্যের বীজস্বরূপ সৎস্বভাব লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার বিপরীত করিয়া নিজেই খাহেশ ও ক্রোধের দাস হইয়া পড়িলে তাহার মধ্যে কতগুলি জঘন্য স্বভাব বিকাশ পাইবে। উহাই তাহার দুর্ভাগ্যের বীজস্বরূপ হইয়া থাকিবে। তাহার প্রকৃত অবস্থা স্বপ্নে বা জাগরণে যদি তাহাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো হয় তবে সে দেখিতে পাইবে যে, একটি শূকর, কুকুর বা শয়তানের সম্মুখে সে ব্যক্তি করজোড় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন মুসলমানকে কাফিরের অত্যাচারে নিঃসহায় পরিত্যাগ করিলে কাফির যেমন মুসলমানের দূর্দশার একশেষ করিয়া থাকে। লোকে যদি বিচার ও চিন্তা করিয়া দেখে তবে বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা দিবারাত্র নফসানী খাহেশের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। প্রকাশ্য আকৃতিতে তাহাদের মানুষরূপে দেখা গেলেও কিয়ামতের দিন তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বাহির হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের মানুষরূপে দেখা গেলেও কিয়ামতের দিন তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বাহির হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের আকৃতিও তখন তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী হইবে। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত সে তখন ব্যাঘ্র বা কুকুরের আকার ধারণ করিবে। এই জন্য কথিত আছে, "যে ব্যক্তি স্বপ্নে ব্যাঘ্র দেখিতে পায়, তাহার অর্থ জালিম লোক; কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শূকর দেখিলে ইহার অর্থ অপবিত্র নোংরা লোক।" নিদ্রা মৃত্যুর নমুনাস্বরূপ। নিদ্রার প্রভাবে মানুষ এই জগত হইতে যত দূরবর্তী হইতে থাকে ততই তাহার আকৃতি ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি বাহ্য আকৃতি তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির অনুরূপ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। এ-সকল গভীর রহস্যের কথা। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই পুস্তকে সমাবেশ হইবে না।

প্রবৃত্তি বিশেষের অনুসরণে ভাব বিশেষের উৎপত্তি

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, মানুষের প্রতি আদেশ জারি করিবার ও তাহাকে চালাইবার জন্য চারি প্রকার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন্‌টির অধীনতায় তোমার গতিবিধি ও কাজকর্ম চলিতেছে, তাহা তোমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। আর ইহাও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া লও যে, তুমি যে কার্যই কর না কেন, তাহার ফলস্বরূপ তোমার আত্মায় এক প্রকার গুণ বা ভাব উৎপন্ন হইবে এবং এই সকল গুণ বা ভাব পরকালেও তোমার সঙ্গে থাকিবে। এই গুণকেই স্বভাব বলে। মানব স্বভাব উল্লিখিত চারি প্রকার হুকুমদাতা প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। তুমি খাহেশরূপ শূকরের অধীন হইয়া চলিলে তোমার স্বভাবে অপবিত্রতা, নির্লজ্জতা, লোভ-চাটুকারিতা, হিংসা ইত্যাদি কুস্বভাবের উৎপন্ন হইবে। অপরপক্ষে এই শূকরকে

দাবাইয়া রাখিলে তোমার মধ্যে অল্পে তুষ্টি, লজ্জাশীলতা, বিচক্ষণতা, পবিত্রতা, নির্লোভতা, বিনয় ইত্যাদি সদগুণ প্রকাশিত হইবে। আবার ক্রোধরূপ কুকুরের বশীভূত হইলে দুঃসাহস, অপবিত্রতা, দাম্ভিকতা, গর্ব, অহংকার, প্রভু-প্রিয়তা, ভর্ৎসনা, অত্যাচার, অপরের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি স্বভাব তোমাতে প্রকাশিত হইবে। পরন্তু সেই কুকুরকে শাসনে রাখিতে তোমার মধ্যে ধৈর্য, গাম্ভীর্য, ক্ষমতা, স্থিরতা, বীরত্ব, নীরবতা, সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি সদগুণ প্রকাশিত হইবে। যে শয়তানী প্রবৃত্তি পূর্বোক্ত শূকর-প্রকৃতিতে প্রলুব্ধ করিয়া দুঃসাহসিক করিয়া তোলে ও প্রতারণা শিক্ষা দেয় তাহার বশবর্তী হইয়া চলিলে তোমাকে প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, হিংসা-বিদ্বেষ, ছলনা প্রভৃতি কুস্বভাব প্রকাশিত হইবে। পরন্তু তুমি যদি সেই শয়তানী প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া রাখ ও তাহার ধোঁকায় না পড় এবং বুদ্ধির লস্করকে বলবান করিয়া তোল তবে তোমাতে বিজ্ঞতা, জ্ঞান, কৌশল, নিপুণতা, সৎস্বভাব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব প্রভৃতি সদগুণ প্রকাশিত হইবে। এই সকল সদগুণ চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকিবে এবং তোমার মৃত্যুর পর উহা স্থায়ী সৎকার্যের প্রস্রবণ ও তোমার সৌভাগ্যের বীজ হইবে।

পাপ-পুণ্য ঃ যে সকল কর্মে মন্দ গুণ ও মন্দ স্বভাব জন্মে উহাদিগকে পাপকর্ম বলে। অপরপক্ষে যে সকল কার্যে সদ্‌গুণ ও উত্তম স্বভাবের উৎপন্ন হয় উহাদিগকে পুণ্যকর্ম বলে। মানুষের সকল গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ পাপ-পুণ্য এই দুই অবস্থা ব্যতীত অন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না।

আত্মা দর্পণ সদৃশ ঃ মানবাত্মা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং মন্দ স্বভাবে ধোঁয়া ও অন্ধকারসদৃশ। ইহা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করিয়া ফেলে। ইহা কিয়ামত দিবসে মানবকে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে বঞ্চিত রাখিবে। পরন্তু সৎস্বভাব উজ্জ্বল আলোকস্বরূপ। ইহা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আত্মার মলিনতা ও পাপ দূর করিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ـ

অর্থাৎ "প্রত্যেক মন্দ কার্যের পর সৎকার্য কর। কারণ সৎকার্য অসৎ কার্য মিটাইয়া দেয়।"

কিয়ামত দিবসে মানবাত্মা উজ্জ্বল সৌন্দর্যবিশিষ্ট বা অন্ধকারাবৃত মলিন হইয়া বিচারক্ষেত্রে উত্থিত হইবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট নিষ্কলঙ্ক আত্মা লইয়া আসিবে সে ব্যতীত অপর কেহই নাজাত পাইবে না।"

সৃষ্টির প্রারম্ভে আত্মা এমন লৌহের ন্যায় থাকে যদ্দ্বারা স্বচ্ছ দর্পণ নির্মিত হয়। লৌহ-দর্পণে যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে, আত্মার মধ্যেও তদ্রূপ বিশ্বের সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। কিন্তু লৌহ-দর্পণকে অতি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে না পারিলে উহা মরিচার ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা তখন প্রতিবিম্ব ধারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে। আত্মার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এই সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থাৎ "তাহা নহে, বরং নিজ কর্মের দোষে তাহাদের আত্মার উপর মরিচা পড়িয়াছে।"

মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঃ এখানে প্রশ্ন হইতে পরে–মানুষের মধ্যে যখন ইতর প্রাণীর স্বভাব, শয়তানের স্বভাব ও ফেরেশতার স্বভাব বিদ্যমান আছে তখন কিরূপে জানিব যে, ফেরেশতার স্বভাবই মানুষের আসল গুণ–উহা ব্যতীত আর সকল গুণ ও স্বভাবই নৈমিত্তিক? আবার কেমন করিয়াই বা বুঝিব যে, মানুষ কেবল ফেরেশতা স্বভাব অর্জনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে– অন্য গুণের জন্য নহে? তবে শোন ; তাহা হইলেই বুঝিবে, ইতর প্রাণী ও হিংস্র জন্তু অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পূর্ণতার একটি শেষ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এবং কেহই এই সীমা অতিক্রম করিয়া অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আর যাহার উন্নতি যে সীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সীমা পর্যন্ত উন্নতি করিবার জন্যই তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। একটি উপমা দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। ঘোড়া গাধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, গাধা শুধু ভারবহনের জন্যেই সৃষ্ট, কিন্তু ঘোড়া গাধার ন্যায় ভারও বহন করিতে পারে, আবার যুদ্ধের সময় যোদ্ধাকে পৃষ্ঠে লইয়া তাহার ইঙ্গিত অনুসারে চলাফেরা করিবার ক্ষমতাও রাখে। এই জন্যই গাধা অপেক্ষা ঘোড়ার শ্রেষ্ঠত্ব অধিক। ঘোড়া যদি এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে না পারে তবে গর্দভত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন গর্দভের ন্যায় ভারবহন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না। ইহা ঘোড়ার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতি ও অধোগতি। তদ্রূপ কোন কোন লোক পানাহার, নিদ্রা ও স্ত্রীসম্ভোগের জন্যই মানব সৃষ্টি হইয়াছে মনে করিয়া কেবল এই সকল কার্যেই স্বীয় পরমায়ু ধ্বংস করে। আবার কোন কোন সম্প্রদায় আরবী ও তুর্কীদের ন্যায় মনে করে যে, অপরকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই দুইটি মতই ভ্রমাত্মক। কেননা, পানাহার, স্ত্রীসম্ভোগ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সম্পন্ন হয়। এই প্রবৃত্তি ইতর জন্তুরও আছে। বরং উটের পানাহার শক্তি ও বাবুই পক্ষীর কাম-শক্তি মানুষের অপেক্ষা অনেক অধিক।

এমতাবস্থায় পানাহার, মৈথুন কার্যে উন্নতি লাভই যদি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে কিরূপে মানুষকে উট ও বাবুই পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে? অপর পক্ষে অন্যকে পরাজিত করা ক্রোধের কার্য। হিংস্র জন্তুরও ক্রোধ আছে। অতএব নিকৃষ্ট প্রাণী ও হিংস্র জন্তুর প্রকৃতিতে যে ভাব আছে তাহা মানুষের মধ্যেও আছে। তবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? কেবল বুদ্ধির জন্যই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। বুদ্ধি আছে বলিয়াই মানুষ আল্লাহ্কে চিনিতে পারে এবং তাঁহার বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্য ও বিস্ময়কর কারিগরি জানিতে পারে। বুদ্ধিবলেই মানুষ নিজকে কাম, ক্রোধ ও লোভের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। ইহাই ফেরেশতার স্বভাব। ইহার প্রভাবেই মানুষ পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। বরং জগতে যাহা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য নিয়মাধীন করা হইয়াছে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

অর্থাৎ "আর যাহা কিছু আকাশে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তৎসমুদয় তিনি তোমাদের জন্য নিয়মাধীন করিয়া দিয়াছেন।"

মানুষের নিত্য ও অনিত্য গুণ ঃ যে গুণ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার মূল কারণ, উহাই তাহার আসল ও নিত্য গুণ। এতদ্ব্যতীত অপর সমস্ত গুণই নৈমিত্তিক অর্থাৎ অন্য কারণে আগত ও অনিত্য। এই অনিত্য গুণগুলি মানুষকে কেবল পূর্ণতা লাভে সাহায্য করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই মানুষ যখন মরে তখন কাম, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু আর তাহার সহিত থাকে না। কিন্তু তখনও দুইটি বস্তুর কোন একটি অবিচ্ছেদ্যরূপে তাহার সহিত থাকে। তন্মধ্যে (১) একটি মানুষের আসল মূল বস্তু ; ইহা ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহ্র মারিফাতে সুশোভিত। ইহা মৃত্যুর পরেও আপনা-আপনিই নেককার লোকের সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় থাকিয়া যায়। ইহাই ফেরেশতাগণেরও চিরসাথী এবং তাঁহার এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা আল্লাহর সন্নিধানে উপস্থিত থাকেন। নেক্কার লোকদের আত্মাও তদ্রূপ সুশোভিত হইয়া আল্লাহ্র সান্নিধানে বিরাজ করিবে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ -

অর্থাৎ "সত্য আসনে ক্ষমতাশীল বাদশাহের নিকট (উপবিষ্ট) থাকিবে।" অপর (২) বস্তুটি মৃত্যুর পর বদকার লোকের সঙ্গে থাকে। ইহা কলঙ্ক-কালিমাপূর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাপের প্রভাবে মানবাত্মার মরিচা ধরে বলিয়া ইহা কলঙ্ক-কালিমাপূর্ণ এবং জীবিতাবস্থায় সে অন্যের প্রতি ক্রোধ ও অবিচার করিয়া আরাম পাইতে বসিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃত্যুকালে এই সকল কুপ্রবৃত্তি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ; কিন্তু

তাহার আত্মার মুখ ইহাদের দিকেই থাকে। কারণ, তাহার সকল লোভনীয় দ্রব্য জীবনের লক্ষ্যবস্তু এই জগতেই থাকিয়া যায়। আর এই জগৎ পর জগতের নিম্নে বলিয়া বদ্‌কারগণ পরকালে উর্ধ্ব-পদ অধো মস্তক অবস্থায় থাকে। এই অর্থেই আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

(অর্থাৎ "আক্ষেপ, যদি তুমি দেখ যখন পাপীগণ আপন পালনকারীর নিকট নিজেদের মাথা নীচু করিয়া থাকিবে।" (সূরা সিজদা, রুকূ ২, পারা ২১)

এই প্রকার বদকার লোক শয়তানের সহিত সিজ্জীনে নিপতিত হইবে। সিজ্জীনের অর্থ সকলে জানে না। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ -

অর্থাৎ "আর সিজ্জীন কি তোমাকে কিসে জানাইবে?"

আত্মার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ আত্মা জগতের আশ্চর্যসমূহের শেষ নাই। সৃষ্টজগতে আত্মা সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এইজন্যই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু বহু লোকে ইহা জানে না। আত্মার শ্রেষ্ঠত্বের দুইটি কারণ আছে, যথা–(১) জ্ঞান ও (২) শক্তি। আত্মার জ্ঞানজনিত শ্রেষ্ঠত্ব আবার দুই প্রকার। ইহার একটি সকলেই বুঝিতে পারে এবং অপরটি নিতান্ত গুপ্ত এবং অতি উত্তম। শেষোক্তটি অতি দুর্লভ। আত্মার জ্ঞানজনিত প্রকাশ্য শ্রেষ্ঠত্ব হইল সকল বিদ্যা ও যাবতীয় শিল্পকৌশল জানিবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলে আত্মা সকল শিল্পকৌশল শিক্ষা করিতে পারে এবং ইহার বলেই মানুষ লিখিত বিষয় পাঠ করিতে পারে ও শিখিতে পারে। অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ ও ধর্মনীতি এই ক্ষমতাবলেই আয়ত্ত হয়। এই ক্ষমতার প্রভাবেই আত্মা এমন পদার্থ যে, ইহা বিভক্ত হইতে পারে না, অথচ ইহাতে সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সমাবেশ হইতে পারে। এমনকি, মরুভূমির মধ্যে সামান্য বালুকণা যেমন লুকাইয়া যায় তদ্রূপ সমস্ত জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানও আত্মার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। চিন্তাবলে আত্মা এক মুহূর্তে পৃথিবী হইতে আকাশে এবং বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিচরণ করিতে পারে। ভূতলে থাকিলেও ইহা আকাশমণ্ডল জরিপ করিতে পারে, এক গ্রহ হইতে অপর গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারে ; সাগরতল হইতে মৎস্যকে কৌশলে উত্তোলন করিতে পারে ; আকাশ বিহারী পক্ষীকে কৌশলে ভূতলে নামাইতে পারে এবং উট, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি অতি শক্তিশালী প্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে। বিশ্বের আশ্চর্য আশ্চর্য জ্ঞান ইহার ব্যবসায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মা এই জ্ঞান আহরণ করে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আত্মার দিকে সকল ইন্দ্রিয়ের এক একটি পথ খোলা রহিয়াছে। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে,

জড়-জগতের দিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন হৃদয়ের পাঁচটি দ্বার, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতের দিকেও হৃদয়ের একটি প্রশস্ত দ্বার খোলা আছে। অধিকাংশ লোকেই কেবল জড়জগতকেই অনুভূতির বিষয় এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকেই জ্ঞানের দ্বার বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই ধারণা সঙ্কীর্ণতা প্রসূত ও অমূলক।

জ্ঞানের দিকে হৃদয়ের যে বহু দ্বার খোলা রহিয়াছে ইহার দুইটি প্রমাণ আছে। প্রথম, স্বপ্ন। নিদ্রিত অবস্থায় প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের আভ্যন্তরিক জ্ঞানদ্বার খুলিয়া পড়ে। তখন আলমে আরওয়াহ্ ও লওহে মাহ্‌ফূজের অজ্ঞাত বিষয়সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা কখনও পরিষ্কারভাবে স্পষ্টত দেখা যায়, আবার কখনো সাদৃশ্যে উপমাস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। যখন সাদৃশ্যে দেখা যায় তখন স্বপ্নের অর্থ করিয়া বুঝিতে হয়। লোকে মনে করে জাগরিত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে জ্ঞান লাভে সমর্থ অথচ জাগ্রত অবস্থায় গায়েবের কোন বিষয়ই নয়নগোচর হয় না। স্বপ্নতত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে সমাবেশ হইবে না। তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

স্বপ্ন তত্ত্ব ঃ আত্মা দর্পণতুল্য এবং লওহে মাহ্‌ফূজও একখানা দর্পণস্বরূপ ; ইহাতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার ছবি অঙ্কিত আছে। একটি স্বচ্ছ আয়নাকে চিত্রিত আয়নার সম্মুখে ধরিলে স্বচ্ছ আয়নাতে যেমন চিত্রিত আয়নার ছবি প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ নির্মল আত্মা লওহে মাহ্‌ফূজের সম্মুখীন হইলে ইহাকে অঙ্কিত সমস্ত বস্তু ও ঘটনার ছবি নির্মল আত্মার মধ্যে পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। তবে লওহে মাহ্‌ফূজের ছবি আত্মায় প্রতিফলিত হওয়ার উপযোগী করিতে হইলে ইহাকে পাপের মলিনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মল রাখিতে হয় এবং জড়জগতের সহিত ইহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করত ইহাকে লওহে মাহ্‌ফূজের সম্মুখীন করিতে হয়। আত্মা যতক্ষণ আত্মা ও লওহে মাহ্‌ফূজের মধ্যে এক আবরণ বিদ্যামান থাকে। নিদ্রার সময়ে আত্মার সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া আপনা আপনিই আধ্যাত্মিক জগত নয়নগোচর হয়। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য স্থগিত থাকিলেও খেয়াল বাকি থাকে। এই জন্যই আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়সমূহ পরিষ্কাররূপে দেখা না গিয়া সাদৃশ্যে উপমাস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মানুষ মরিয়া গেলে খেয়াল বা ইন্দ্রিয় কোনটাই থাকে না; তখন সকল আবরণ বিদূরিত হয় এবং বিশ্বজগতের সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে আত্মার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেই সময় আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় ঃ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -

অর্থাৎ "অনন্তর তোমা হইতে তোমার পর্দা তুলিয়া লইয়াছি, অতঃপর তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইল।" উত্তরে আত্মা বলিবে ঃ

رَبَّنَا ابْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ "হে আমাদের রব, আমরা দেখিলাম ও শুনিলাম ; আমাদিগকে পুনরায় পাঠাও ; আমরা সৎকাজ করিব। নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাসী আছি।"

আধ্যাত্মিক জগতের দিকে আত্মার জ্ঞানদ্বার যে খোলা আছে তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই দুনিয়াতে এমন কোন লোক নাই যাহার হৃদয়ে ইলহামের মধ্যস্থতায় অন্তর্দৃষ্টি ও শুভ প্রেরণা জাগরিত না হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়পথে আসে না, বরং হৃদয়েই উৎপন্ন হয়। উহা কোথা হইতে আসে লোকে জানে না। ইহাতে বুঝা গেল যে, সকল জ্ঞান শুধু বাহ্যজগত হইতে হয় না এবং আত্মা এই জড়জগতের নহে, বরং আধ্যাত্মিক জগত দর্শনে উহারা স্বভাবতই বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব, মানুষ যতদিন জড়জগতের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন না করিবে ততদিন আধ্যাত্মিক জগতের দিকে পথ পাইবে না।

জাগ্রতাবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের উপায় ঃ প্রিয় পাঠক, মনে করিও না যে, স্বপ্ন ও মৃত্যু ব্যতীত আধ্যাত্মিক জগতের দিকে আত্মার দ্বার খোলে না। কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত রিয়াযত-মুজাহাদা ও সাধনা করে ক্রোধ-লোভাদি রিপুসমূহ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখে, মন্দ স্বভাব হইতে আপনাকে পবিত্র রাখে, নির্জনে চক্ষু বন্ধ করত উপবেশনপূর্বক জড়জগত হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে এবং অপর দিকে আধ্যাত্মিক জগতের সহিত আত্মার সংযোগ স্থাপন করত রসনা দ্বারা নহে বরং হৃদয় হইতে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' যিকির করিতে থাকে, এমনকি নিজকে ও সমস্ত বিশ্বজগত ভুলিয়া যায়–এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই তাহার খবর থাকে না, তবে জাগ্রত অবস্থায়ও তাহার অন্তর্দ্বার খোলা থাকিবে। লোকে স্বপ্নে যাহা দেখিতে পায় এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থাতেই তাহা দেখিতে পাইবে, ফেরেশ্তাগণ মনোহর মূর্তিতে তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে আর সে ব্যক্তি পয়গম্বরগণকে দেখিতে পাইবে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইবে, আস্মান-যমীনের সমস্ত রাজ্য তাহার নয়নগোচর হইবে। যাহার প্রতি এই পথ খোলা হইয়াছে, তিনি বিশ্বজগতের আশ্চর্য আশ্চর্য তামাশা দেখিতে পান এবং এমন এমন ব্যাপার তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় যাহা বর্ণনাতীত। এই অবস্থা সম্বন্ধেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমাকে সমস্ত জগত দেখানো হইয়াছে। অনন্তর আমি বিশ্বের পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত দেখিয়াছি।" আল্লাহ্ও এই অবস্তা সম্বন্ধেই বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ 'আর তদ্রূপ আমি ইব্রাহীম (আ)-কে আসমান ও যমীনের সমস্ত রাজ্য দেখাইয়াছি।'

সমস্ত পয়গম্বরের জ্ঞান এইরূপেই হাসিল হইয়াছিল ; ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বা শিক্ষার পথে অর্জিত হয় নাই। তাঁহাদের রিয়াযত মুজাহাদাই এই জ্ঞানের মূল উৎস ঃ যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً -

অর্থাৎ "সব সম্বন্ধ ছিন্ন করত কেবল তাঁহার (আল্লাহ্র) দিকে আস, সব ছাড়িয়া তাঁহাকেই স্মরণ কর। নিজকে আল্লাহ্র এখতিয়ারে ছাড়িয়া দাও। দুনিয়া অর্জনে লিপ্ত হইও না, তিনি সকল কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন।" তিনি আরও বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً -

অর্থাৎ "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই। অনন্তর তাঁহাকেই কার্যনির্বাহ ধর।" তুমি যখন আল্লাহ্কে কার্যনির্বাহক ধরিলে তখন বেপরোয়া থাক এবং দুনিয়ার সহিত আর মিলিত হইও না। আল্লাহ্ তৎপর বলে ঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً -

অর্থাৎ "আর তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তাহাতে তুমি সবর কর এবং তাহাদিগকে সদ্ভাবে ছাড়িয়া দাও।"

জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ হইতে কিরূপ সাধনা ও পরিশ্রম করিতে হয় তাহা শিক্ষা পাওয়া যায়। তদনুযায়ী আমল করিতে লোকের সহিত শত্রুতা, দুনিয়ার লোভ-লালসা, ইন্দ্রিয় চরিতার্থে লিপ্ততা প্রভৃতি দোষ হইতে হৃদয় নির্মল হইয়া উঠে। ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করত এরূপ জ্ঞান লাভ করা আলিমগণের তরীকা। ইহা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু নবীগণের তরীকার তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ। আম্বিয়া আওলিয়াগণ বিনা উস্তাদে আল্লাহ্র দরবার হইতে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা মানবের নিকট হইতে অর্জিত জ্ঞান হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। বিনা উস্তাদে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা বহু অভিজ্ঞতা যুক্তি প্রমাণে সাব্যস্ত হইয়াছে। তুমি যদি স্বীয় স্বাভাবিক অনুরাগ প্রভাবে তদ্রূপ অবস্থা লাভ করিতে না পার, উস্তাদের উপদেশও লাভ করিতে অক্ষম হও এবং যুক্তি-প্রমাণেও বুঝিতে না পার তথাপি অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে, সেইরূপ অবস্থায় উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা মানুষের আছে ঃ তাহা হইলেও তুমি অবিশ্বাসী হইয়া এই তিন শ্রেণী হইতে বহির্গত হইবে না। এই সকল অন্তরজগতের বিস্ময়কর ব্যাপার এবং উহা হইতেই আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়।

আত্মার আদিম অবস্থা ঃ উক্ত প্রকার জ্ঞান শুধু পয়গম্বরগণের একচেটিয়া, তাঁহার ব্যতীত আর কেহই উহা লাভ করিতে পারে না, এরূপ মনে করিও না। বরং সকল মানবাত্মাই আদিম অবস্থায় তদ্রূপ উপযুক্ত থাকে। সৃষ্টিগতভাবে এমন কোন লোকই নাই যাহা স্বচ্ছ আয়না তৈরির উপযোগী নহে, যাহাতে বিশ্বজগতের সকল পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে। কিন্তু লৌহে মরিচা ধরিয়া ইহাকে আসলেই নষ্ট করিয়া দিলে ইহার প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা আর থাকে না। আত্মার অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সংসারের লোভ, কুপ্রবৃত্তি ও পাপ দ্বারা আত্মা আচ্ছাদিত ও কলুষিত হইলে উহা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। এই সম্বন্ধেই হাদীসে উক্ত আছে ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَ يُنَصِّرَانِهٖ وَيُمَجِّسَانِهٖ ـ

অর্থাৎ, "প্রত্যেক মানব সন্তানই মুসলমানরূপে জন্মগ্রহণ করে। তৎপর তাহাদের মাতাপিতা যে যেইরূপ তাহাদিগকে ইয়াহুদী খ্রিস্টান বা অগ্নি উপাসকরূপে পরিণত করে। সকল মানবই জ্ঞান লাভে উপযুক্ত। তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ـ

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তাহারা বলিল– হ্যাঁ।"

কোন ব্যক্তি যদি অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে–দুই কি এক অপেক্ষা অধিক নহে? উত্তরে সকলেই বলিবে–হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অধিক। যদিও ইহার যথার্থ সকলে শুনে নাই, মুখেও বলে তথাপি সকলের হৃদয়েই ইহার সত্যতা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তদ্রূপ আল্লাহ্র সম্বন্ধে জ্ঞানও সৃষ্টিগতভাবে সকলের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, "আর যদি আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন–কে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে– আল্লাহ্।"

তিনি আরও বলেন ঃ

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ "যে প্রকৃতির উপর মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রকৃতি।"

যুক্তি-প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারাও জানা গিয়াছে যে, বিনা উস্তাদে জ্ঞান লাভ ও অদৃশ্য বস্তু দর্শন কেবল পয়গম্বরদের একচেটিয়া নহে। কারণ পয়গম্বরগণও মানুষ। আল্লাহ্ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ

অর্থাৎ, "বলুন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহি।"

নবী ও ওলী ঃ যে ব্যক্তির প্রতি সেইরূপ জ্ঞানের পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে যদি আল্লাহ্ জগতের মঙ্গল কিসে হয় তাহা শিক্ষা দেন এবং তিনিও বিশ্ববাসীকে আহ্বান করত তদনুযায়ী হিদায়েত করেন তবে তিনি আল্লাহ্র নিকট হইতে যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন তাকে শরীয়ত বলে ও তাঁহাকে নবী বলা হয়। নবীর অলৌকিক কার্যকলাপকে মু'জিযা বলে। আর তদ্রূপ ব্যক্তি যদি সমস্ত বিশ্ববাসীকে আহ্বানপূর্বক হিদায়েত করিবার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত না হন তবে তাঁহাকে ওলী বলে এবং তাহার অলৌকিক কার্যকলাপকে কারামত বলে। আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে বিভূষিত ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আপনা-আপনিই বিশ্বমানবের হিদায়েত কার্যে লিপ্ত হওয়া জরুরী নহে। বরং আল্লাহ্ নিজ ক্ষমতায় এক এক ব্যক্তিকে যোগ্যতানুসারে এক এক কার্যে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। কোন ওলীকে বিশ্বের হিদায়েতের ভার অর্পণ না করার বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে। হয়ত তখন শরীয়ত জীবিত আছে এবং তজ্জন্য বিশ্ববাসীকে নূতনভাবে আর শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই অথবা জগতের শিক্ষাগুরু হওয়ার জন্য নবীগণের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক উহা তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে নাই।

ওলীর উন্নত অবস্থা সাধনাসাপেক্ষ ঃ ওলীগণের আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তি ও কারামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আর জানিয়া রাখ যে, ওলীগণের এই উন্নত অবস্থা প্রথমত কঠোর সাধনার উপর নির্ভর করে– বিনা সাধনায় ওলী হওয়া যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষিকার্য করে সে শস্যও পাইবে, যে ব্যক্তি পথ চলে সে গন্তব্যস্থানেও পৌঁছিবে এবং যে অনুসন্ধান করে সে বাঞ্ছিত বস্তুও লাভ করিবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। যে কার্য যত গৌরবের ইহার শর্তাবলীও তত অধিক এবং ইহা অর্জন করাও ততই দুষ্কর। জ্ঞানলাভের কার্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ কার্য, তন্মধ্যে আল্লাহ্র পরিচয়–জ্ঞান সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত। বিনা সাধনা ও মুর্শিদে-কামিল ব্যতীত এই পথে চলা যায় না। আবার উপযুক্ত সাধনা ও মুর্শিদে কামিল থাকিলেও আল্লাহ্র সাহায্য না হইলে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে সেইরূপ সৌভাগ্য অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ না থাকিলে গৌরবের সেই উন্নত সীমায় উপনীত হওয়া যায় না। জাহেরী ইল্‌মে নেতৃত্ব লাভ ও যাবতীয় কার্যের বেলায়ই এ কথা খাটে।

আত্মার ক্ষমতাজনিত শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মানবাত্মার জ্ঞানজনিত শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিত বর্ণিত হইল। এখন ইহার ক্ষমতাজনিত শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলা হইতেছে। এই প্রকার শ্রেষ্ঠত্বও ফেরেশতাদের এক গুণ, এ গুণ পশুপক্ষীর নাই। জড়জগতের কার্য পরিচালনার জন্য ফেরেশতাগণ নিযুক্ত আছেন। জগতের পক্ষে যখন বৃষ্টি হিতকর ও আবশ্যক হয় তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র আদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাঁহারা বসন্তকালে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত করেন, বাচ্চাদানিতে জীবের মূর্তি এবং জমিতে উদ্ভিদের আকার গঠন করত বর্ধিত করেন। এক এক রকম কার্যে এক এক শ্রেণীর ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। মানবাত্মাও ফেরেশতা জাতির অন্তর্ভুক্ত। আত্মাকেও আল্লাহ্ ক্ষমতা দিয়াছেন এবং জড়জগতের কিয়দংশ ইহার অধীন করিয়া রাখিয়াছেন।

স্বীয় দেহে আত্মার অপ্রতিহত ক্ষমতা ঃ যে সকল বস্তু আত্মার অধীনে আছে তন্মধ্যে স্বীয় দেহই প্রধান। কারণ, দেহের কোন অঙ্গেই আত্মা আবদ্ধ নহে; অথচ সমস্ত দেহই আত্মার আদেশে চলে। যেমন, আত্মা অঙ্গুলীর মধ্যে নহে, ইহাতে জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তিও নাই ; অথচ আত্মার আদেশে অঙ্গুলী পরিচালিত হয়। হৃদয়ের ক্রোধের সঞ্চার হইলে সমস্ত শরীর হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। ইহা বারিবর্ষণ তুল্য। কামভাব হৃদয়ে প্রবল হইলে শরীরে একপ্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং ইহার গতি অঙ্গ বিশেষের দিকে পরিচালিত হয়। অন্তরে আহারের ইচ্ছা হইলে রসনার নিম্নস্থ এক প্রকার শক্তি খেদমতের জন্য প্রস্তুত হয় এবং খাদ্যদ্রব্য ভিজাইবার জন্য লালা রস বাহির করে যাহাতে আহার্যবস্তু সহজেই উদরস্থ হইতে পারে। এই সকল বিষয় হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, শরীরের উপর আত্মার প্রভুত্ব চলিতেছে এবং শরীর আত্মার অধীন।

অন্যান্য পদার্থের উপর আত্মার প্রভাব ঃ ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যে সকল আত্মা অতি শ্রেষ্ঠ ও বলবান এবং যে সকল আত্মায় ফেরেশতাগণের মাত্রা বেশি, স্বীয় শরীর ব্যতীত অন্যান্য পদার্থও তাহাদের অধীন হইয়া থাকে। এইরূপ আত্মার প্রতাপ সিংহ-ব্যাঘ্রের উপর পড়িলে তাহারাও নম্র ও অধীন হইয়া পড়ে। আবার কোন সুস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সে পীড়িত হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তিকে নিকট পাইতে ইচ্ছা করিলে সেও তাঁহার নিকট আগমনের ইচ্ছা করে। তদ্রূপ ব্যক্তি বৃষ্টি পাইতে চাহিলে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। আত্মার যে এই প্রকার ক্ষমতা আছে তাহা যুক্ত দ্বারা প্রমাণ করার যায় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত সত্য। বদনযর ও যাদু এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্ভুক্ত। সকল বস্তুর উপরই মানবাত্মার প্রভাব আছে। হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি যদি কোন পশুর দিকে বদনজর করত ইহাকে বিনাশ করিতে চায় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; তেমনি হাদীস শরীফে উক্ত আছে–"বদনজর মানুষকে কবরে ও উটকে ডেগে লইয়া যায়।" আত্মার ক্ষমতাসমূহের মধ্যে ইহা একটি বিস্ময়কর ক্ষমতা।

মু'জিযা, কারামত ও যাদু ঃ পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তদ্রূপ অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পাইলে উহাকে মু'জিযা ও ওলীগণের মাধ্যমে প্রকাশ পাইলে উহাকে কারামত বলে এই প্রকার গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সৎকার্যে প্রবৃত্ত থাকিলে তাঁহাকে ওলী বলে এবং অন্যায়কার্যে লিপ্ত থাকিলে তাহাকে যাদুকর বলে। যাদু, মু'জিযা, কারামত, এই সমস্তই মানবাত্মার অলৌকিক ক্ষমতার কার্য। কিন্তু উহাদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। এই প্রভেদের বিস্তারিত বর্ণনা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমাবেশ হইবে না।

নবুওতের হাকীকত ঃ উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা যে ব্যক্তি ভালরূপে বুঝতে না পারিবে সে নবুওতের হাকীকত বুঝিতে পারিবে না ; তবে অপরের মুখে শুনিয়া এতটুকু বুঝিতে পারিবে যে, নবুয়ত ও বেলায়েত মানবাত্মার অতি গৌরবান্বিত সোপানসমূহের অন্যতম। এরূপ উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত লোক তিন প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, যথা–(১) স্বপ্নে সর্বসাধারণ লোকে যাহা দেখিতে পায়, তাহারা জাগ্রতাবস্থায় তাহা সুস্পষ্ট জানিতে পারেন। (২) সর্বসাধারণের আত্মা কেবল নিজ শরীরের উপরই আধিপত্য চালাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা জগতের মঙ্গল সাধনে স্বীয় শরীর ব্যতীত সমস্ত বস্তুর উপর আধিপত্য চালাইতে পারে। (৩) সাধারণ লোক যে ইল্‌ম উস্তাদের নিকট শিক্ষা করিয়া লাভ করে, তাঁহারা ইহা বিনা উস্তাদে স্বীয় হৃদয়ে লাভ করিয়া থাকেন। যাহাদের বুদ্ধি একটু প্রখর ও আত্মা কতকটা পবিত্র তাহারা বিনা শিক্ষায় কোন কোন বিদ্যা লাভ করিতে পারেন। এমত অবস্থায় যাঁহারা অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাঁহাদের আত্মা খুব পবিত্র, তাঁহারা বিনা উস্তাদে নিজে নিজে প্রচুর ইল্‌ম বা সমস্ত ইল্‌ম লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রকারে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইল্‌মে লাদুনী বলে যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ـ

অর্থাৎ "আর আমি তাহাকে আমার নিকট হইতে ইল্‌ম শিখাইয়াছিলাম।" (সূরা কাহাফ, রুকূ ৮, ১৫ পারা। যে ব্যক্তি উক্ত ত্রিবিধ গুণে গুণান্বিত, তিনি শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরগণের বা শ্রেষ্ঠ ওলীগণের অন্তর্ভুক্ত। যাহার মধ্যে এই তিনটি গুণের একটি থাকে। তিনিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে তাঁহারা এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। কারণ কাহারও মধ্যে ঐ ত্রিবিধ গুণই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে অতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁহার নবুওতের উন্নত অবস্থার কথা অবগত হইয়া যাহাতে বিশ্ববাসী তাঁহার অনুসরণ করে এবং সৌভাগ্যের পথ পায় তজ্জন্য আল্লাহ্ উক্ত তিনটি গুণের প্রত্যেকটিরই আভাসমাত্র সকলকেই দান করিয়াছেন। এই কারণেই কেহ স্বপ্নে দেখেন ; কেহ বা স্বীয় প্রভাবে অপরের বুদ্ধি সুপথে পরিচালিত করেন, আবার কেহ বা স্বীয় হৃদয়কে

বিনা উস্তাদে জ্ঞানলাভের উপযোগী পাইয়া থাকেন। যে বস্তুর জ্ঞান নাই তৎপ্রতি লোকে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। কারণ, যাহার ছায়ামাত্রও হৃদয়ে নাই তাহার আকৃতি কখনও বুঝা যায় না। এই জন্যই আল্লাহ্‌র হাকীকত আল্লাহ্ ব্যতীত যথাযথভাবে অপর কেহই বুঝিতে পারে না। এই বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা বহু বিস্তৃত। 'মাআনী আসমা ইল্লাহ্' কিতাবে স্পষ্ট দলিলের সহিত আমি ইহা বর্ণনা করিয়াছি।

ওলী ও পয়গম্বগণের গুণ সাধারণের ধারণাতীত ঃ মোটকথা এই, উপরে যে তিন প্রকার গুণের কথা বলা হইল উহা ছাড়া আর বহু উৎকৃষ্ট গুণ তাঁহাদের আছে যাহার ছায়াও সাধারণের মধ্যে নহে এবং আমরা সৎসমুদয় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আল্লাহ্ ব্যতীত যেমন কেহ আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে না, তদ্রূপ পয়গম্বরকেও পয়গম্বর ব্যতীত অপর কেহই সম্যকরূপে চিনতে পারে না। তবে পয়গম্বর নিজকে এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর তাঁহাকে চিনতে পারেন। মানুষের মধ্যে পয়গম্বরগণের মর্যাদা কেবল পয়গম্বরগণই জানেন। আমরা ইহার অধিক আর কিছুই জানি না। আমরা যদি নিদ্রার অবস্থা না জানিতাম এবং কেহ আমাদিগকে বলিত–"অমুক ব্যক্তি বেহুঁশ ও নিশ্চল অবস্থায় কিছুক্ষণ ভূতলে পতিত ছিল তখন সে দেখিতে ও শুনিতে পায় নাই এবং কি ঘটিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারে নাই, কতক্ষণ পর আবার দেখিতে শুনিতে লাগিল, তবে ইতিপূর্বে তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিত না এবং আমরাও উহা বিশ্বাস করিতাম না। কারণ, মানুষ যাহা দেখে নাই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ ـ

অর্থাৎ "বরং যে বিষয় (কুরআন) তাহাদের জ্ঞানে বেড় পাইল না এবং যাহার মত তাহাদের নিকট পরিষ্কার হইল না ইহাকে তাহারা মিথ্যা জানিল।"

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "আর যখন তাহারা (কুরআনের দ্বারা) পথ পায় নাই তখন নিশ্চয়ই বলিবে যে, ইহা একটি পুরাতন মিথ্যা।"

ওলী ও পয়গম্বরগণের এমন গুণ আছে যাহার সন্ধানও অপর লোকে জানে না এবং তাঁহারা ইহার কারণে এক অনির্বচনীয় সুখাস্বাদ ভোগ করেন ও অলৌকিক অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই কথা শুনিয়া তুমি আশ্চর্যবোধ করিও না। কারণ, তুমি জান যে কবিতার প্রতি যাহার আসক্তি নাই, সুরভঙ্গি নাই, সুরভঙ্গিতে সে কোন আনন্দ পায় না। কবিতার প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তিকে কেহই কবিতার মাধুর্য বুঝাইতে পারে না, কেননা সে

কবিতা সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না। এইরূপ জন্মান্ধ ব্যক্তি বর্ণ-বৈচিত্র্য ও দর্শনের সুখ অনুভব করিতে পারে না। এ বিষয়েও আশ্চর্যবোধ করিও না যে, আল্লাহ্ পয়গম্বরগণকে নবুয়ত প্রদান করার পর আরও কতকগুলি এমন গুণ ও অবস্থা প্রদান করেন যাহা তৎপূর্বে তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

জাহেরী ইল্‌ম রূহানী ইল্‌মের অন্তরায় ঃ এ পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা গেল এবং সূফীগণের পথ কি, তাহাও প্রকাশ পাইল। তুমি হয়ত শুনিয়া থাকিবে যে, সুফীগণ বলেন, জাহেরী ইল্‌ম তাঁহাদের পথের অন্তরায় এবং হয়ত তুমি ইহা অস্বীকারও করিয়া থাকিবে। তুমি একথা অবিশ্বাস করিও না। সূফীগণের একথা সত্য। কারণ, তুমি যদি জড়জগত ও জড়জগতের জ্ঞান লইয়াই মশগুল থাক তবে তুমি সূফীগণের উন্নত অবস্থা হইতে দূরে বহুদূরে এক পর্দার অন্তরালে পড়িয়া থাকিবে। মানবাত্মা কূপসদৃশ। পাঁচ ইন্দ্রিয় যেন এই কূপের পাঁচটি নালা ইন্দ্রিয়রূপ নালাপথে বাহিরজগতের জ্ঞানীরূপ পানি সর্বদা আত্মারূপ কূপে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। কূপের তলদেশ হইতে পরিষ্কার পানি বাহির করিবার তোমার ইচ্ছা থাকিলে প্রথমে নালা কয়টিকে বন্ধ করিয়া দাও, যাহাতে বাহিরের পানি ভিতরে আসিতে না পারে। তৎপর কূপে সঞ্চিত সমস্ত পানি ও কর্দমাদি বাহির করিয়া ফেল। অবশেষে কূপের তলদেশে খনন কর। তাহা হইলে দেখিবে, পাতাল হইতে পরিষ্কার পানি আসিয়া কূপ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিবে। যতক্ষণ পূর্বসঞ্চিত পানিতে কূপ পরিপূর্ণ থাকে এবং বাহির হইতে পানি আসিবার পথ খোলা থাকে ততক্ষণ পাতাল হইতে নির্মল পানি উঠিতে পারে না। এইরূপ, যতক্ষণ বাহ্য জ্ঞান মন হইতে বিদূরীত না হইবে ততক্ষণ আত্মার অভ্যন্তর হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। কিন্তু আলিম যদি অর্জিত ইল্‌ম হইতে স্বীয় হৃদয় খালে করিয়া ফেলে এবং উহাতে লিপ্ত না থাকে তবে তদ্রূপ ইল্‌ম তাহার জন্য অন্তরাল হয় না বরং তাহার অন্তর্চক্ষু খুলিয়া যায় এবং নির্মল ইল্‌ম তাহার হৃদয়ে উৎপন্ন হইতে থাকে। এমনিভাবে জড়জগতের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহের সম্মিলনে হৃদয়ে যে সকল খেয়ালের উদয় হয় তৎসমুদয় হইতে হৃদয় মুক্ত রাখিলে উহা আর তত্ত্বজ্ঞানের পথে অন্তরাল হইবে না। অর্জিত ইল্‌ম এ পথে অন্তরাল কেন হয় এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকিদাসমূহ শিক্ষা করিয়াছেন, এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের যাবতীয় আবশ্যক দলিল প্রমাণাদিও সংগ্রহ করিয়াছেন, নিজকে সম্পূর্ণরূপে উহাতেই লিপ্ত রাখিয়াছেন এবং বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন যে, এই ইল্‌ম ব্যতীত আর ইল্‌মই নাই। এমতাবস্থায় তাহার হৃদয়ে কোন নূতন জ্ঞানের উদ্ভব হইলে তিনি বলিবেন– "যাহা আমি শিখিয়াছি ইহা তাহার বিপরীত এবং যাহা আমার জ্ঞানের বিপরীত তাহা মিথ্যা।" এই প্রকার লোকের জন্য কোন কিছুর হাকীকত উপলব্ধি করা

একেবারে অসম্ভব। কারণ সাধারণ লোককে তাঁহারা যে আকীদা শিখাইয়া থাকেন তাহা হাকীকতের ছাঁচমাত্র, আসল হাকীকত নহে। অস্থি হইতে যেমন মজ্জা বাহির হয় তদ্রূপ সেই ছাঁচ হইতে যে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয় তাহাকেই আসল হাকীকত ও পূর্ণ মা'রিফাত বলে। যে আলিম ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য কেবল তর্ক-বিতর্কের কৌশল শিক্ষা করেন তাঁহার প্রতি হাকীকত প্রকাশ পায় না। কারণ এমন আলিম মনে করেন, "সমস্ত ইল্‌মই আমি শিখিয়া লইয়াছি।" এইরূপ ধারণাই প্রকৃত জ্ঞানের পথে তাহার অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা সামান্য ইল্‌ম শিখিয়াছেন তাঁহাদের মনে এই ধারণা বলবান থাকে। এই জন্যই তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত ও পর্দার অন্তরালে থাকেন। কিন্তু যে আলিম তদ্রূপ ধারণা করেন না তাঁহার নিকট অর্জিত ইল্‌ম কিছুমাত্র বাধা জন্মায় না ; বরং অজ্ঞানতার সমস্ত পর্দা তাঁহার সম্মুখ হইতে বিদূরিত হয়, তাঁহার কাশ্‌ফ হইতে থাকে এবং তিনি পূর্ণতা লাভ করেন। প্রথম হইতে জ্ঞানের পথে যাহার পদ দৃঢ় হয় নাই তাহার পথ হইতে তদ্রূপ আলিমের পথ খুব ভয়শূন্য ও সরল। যে ব্যক্তি আলিম নহে সে হয়ত দীর্ঘকাল কোন মিথ্যা খেয়ালে জড়িত থাকে এবং ফলে সামান্য সন্দেহই তাহার পক্ষে প্রবল অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আলিম এরূপ বিপত্তি হইতে নিরাপদে থাকেন।

জাহেল ভণ্ড সূফী ঃ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি বাহ্য ইল্‌মকে প্রকৃত ইল্‌মের পথে অন্তরাল বলেন তবে তাঁহার কথা অবিশ্বাস না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। কিন্তু আজকাল কতক লোক বাহির হইয়াছে, তাহারা অবৈধকে বৈধ বলিয়া থাকে। এই হতভাগারা রিপুর দাস। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের অবস্থা তাহারা কখনই প্রাপ্ত হয় নাই ; কেবল সূফীদের রচিত কতকগুলি রহস্যময় বাক্য মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। পরহিযগারী দেখাবার জন্য বারবার শরীর ধৌত করে, সূফীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, জায়নামায ইত্যাদি দ্বারা শরীর সজ্জিত রাখে এবং ইল্‌ম ও আলিমগণের নিন্দা করিতে থাকে। তাহারা মানুষের মধ্যে শয়তান, আল্লাহ্ ও রাসূলের দুশমন ; তাহারা হত্যার উপযোগী। কারণ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (সা) ইল্‌ম ও আলিমের প্রশংসা করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতবাসীকে ইল্‌ম শিখিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই হতভাগারা সূফীদের অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই এবং ইল্‌মও শিখে নাই। এমতাবস্থায় ইল্‌ম ও আলিমের নিন্দা করা তাহাদের পক্ষে কিরূপে বৈধ হইতে পারে? এই সকল হতভাগা এমন ব্যক্তির ন্যায় যে লোকমুখে শুনিয়াছে পরশমণি স্বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, ইহার সাহায্যে অপরিমিত স্বর্ণ প্রস্তুত করা যায়। এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া সে তাহার সম্মুখে স্থাপিত অপরিমিত স্বর্ণরাশি গ্রহণ না করিয়া বলিতে লাগিল–"স্বর্ণ কি কাজে লাগে? ইহার মূল্যই বা কতটুকু? আমি পরশমণি চাই, পরশমণিই স্বর্ণের মূল।" এই বলিয়া সে স্বর্ণ গ্রহণ করিল না। অথচ সে পরশমণি কখনও দেখেও নাই এবং জানেও

না যে, ইহার কেমন পদার্থ। এই প্রকার লোক নিতান্ত হতভাগা, নিঃস্ব ও অতৃপ্ত থাকে। 'স্বর্ণ অপেক্ষা পরশমণি শ্রেষ্ঠ' বাক্য আওড়াইয়া ইহার আনন্দে বেচারা বিভোর থাকে এবং এই প্রকার আরও বহু লম্বা লম্বা কথা বানাইতে থাকে।

আম্বিয়া-আউলিয়া ও আলিমগণের মরতবার তুলনা ঃ আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) পরশমণিতুল্য এবং আলিমগণের ইল্‌ম স্বর্ণসদৃশ। আর স্বর্ণের মালিক অপেক্ষা পরশমণির মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববিষয়ে অধিক। কিন্তু এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে। মনে কর, এক ব্যক্তির নিকট এতটুকু পরশমণি আছে যাহার সাহায্যে এক শতের অধিক স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করা যায় না ; কিন্তু অপরজনের নিকট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কিছুতেই অধিক হইতে পারে না। বর্তমানকালে পরশমণি প্রস্তুত বিদ্যার বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে এবং বহু লোক ইহার অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছে। কিন্তু ইহার হাকীকত অতি অল্প লোকেই জানেন। বহু অনুসন্ধানকারী এ বিষয়ে প্রতারিত হইয়া থাকে। আজকালকার সূফীদের অবস্থাও ঠিক এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত সূফীইজম তাহাদের মধ্যে নাই। কেহ কেহ ইহার সামান্য অংশ পাইয়াছেন। সুফী ইজমে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। এমতাবস্থায় যাহার মধ্যে সূফীদের অবস্থার কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে তিনি কখনই প্রত্যেক আলিম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ সূফীর ভাগ্যে এমন অবস্থা ঘটে যে, প্রথম প্রথম তাঁহাদের প্রতি সূফীদের ভাব সামান্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী না হইয়া অচিরেই বন্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহারা আর পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না। আবার এমন কতক সূফী আছেন যাঁহাদের উপর অলীক পাগলামী ও অসার কল্পনা প্রবল থাকে অথচ উহাকে তাঁহারা সত্য বলিয়া মনে করেন। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যে সত্য-মিথ্যা উভয়ই থাকে। সূফীদের অবস্থার মধ্যেও তদ্রূপ সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ থাকে। যে সকল সূফী এমন কামিল হইয়াছেন যে, যে ইল্‌ম অপর লোকে উস্তাদের নিকট শিক্ষা করে তাহার তাঁহারা বিনা উস্তাদে স্বয়ং আল্লাহ্ হইতে লাভ করিয়া থাকেন তাঁহারা ধর্ম-শাস্ত্রভিজ্ঞ আলিম হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই সূফী নিতান্ত বিরল। অতএব, সূফীগণের আসল জ্ঞানের পথে ও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস স্থাপন কর। একালের ভণ্ড সূফীদের আচরণ দেখিয়া প্রকৃত সূফীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না। ভণ্ড সূফীদের যাহারা ইল্‌ম ও আলিমকে তিরস্কার করে তাহারা নিজেদের মূর্খতার কারণেই ইহা করিয়া থাকে।

আল্লাহর মা'রিফাতে মানবের সৌভাগ্য নিহিত ঃ এখন হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার, কিরূপে বুঝিব যে, আল্লাহ্‌র মা'রিফাতে মানুষের সৌভাগ্য নিহিত আছে? উহার উত্তর বুঝিবার পূর্বে কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক। যে কাজে সুখ ও আরাম পায়, সেই কাজেই তাহার সৌভাগ্য নিহিত আছে। আবার প্রকৃতি যাহা চায় তাহাতেই সুখ ও আরাম আছে এবং যে জন্য যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে প্রকৃতি তাহাই চাহিয়া থাকে—যেমন কামনার বস্তু পাইলেই কামপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, শত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেই ক্রোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় ; সুন্দর বস্তু দর্শনে চক্ষু তৃপ্ত হয় এবং সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে কর্ণ চারিতার্থ হয়। এইরূপ, যে কার্যের জন্য আত্মা সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহা ইহার প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাতেই আত্মার তৃপ্তি নিহিত আছে। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ-দর্শন ও প্রত্যেক বিষয়ের সত্যানুসন্ধান আত্মার কার্য এবং উহাই আত্মার প্রকৃতি। বাসনা-কামনা চতুষ্পদ জন্তুরও আছে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইহারাও জড়পদার্থের অবস্থা অবগত হইতে পারে। কিন্তু স্বরূপ-দর্শন ও সত্যানুসন্ধান আত্মা ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা করা যায় না। এজন্যই অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে মানব মনে এত আগ্রহ এবং অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ গর্ব করে। এমনকি কেহ যদি দাবা খেলার ন্যায় মন্দ কার্যও শিখিতে ইচ্ছা করে এবং যে ব্যক্তি এ বিষয়ে পটু তাহাকে যদি কেহ নিষেধ করিয়া বলে যে, এ খেলা আর কাহারও শিখাইও না তবে এই নিষেধ প্রতিপালন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। আর সে যে এক বিস্ময়কর খেলা জানে এই আনন্দে সে বাহাদুরী দেখাইতে চায়।

আল্লাহ্‌র মা'রিফাতে আত্মার পরম তৃপ্তি ঃ এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ যে, জ্ঞানের মধ্যে আত্মার তৃপ্তি নিহিত আছে। ইহাও জানিয়া রাখ, যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট ও মহৎ হইবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান আত্মার নিকট তত আনন্দদায়ক হইবে। এইজন্যই কেহ মন্ত্রিত্বের রহস্য জানিতে পারিলে আনন্দিত হয়। তৎ পর সেই ব্যক্তির নিকট যদি বাদশাহের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে এবং সে রাজ্যসংক্রান্ত সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তবে তাহার আনন্দ আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে। দাবা-খেলায় পটুতা প্রদর্শন অপেক্ষা যে ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার, আয়তন ইত্যাদি নির্ণয় করিতে পারে সে অধিক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দাবা-খেলায় পটু সে দাবার গুটিস্থাপনে সক্ষম ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। এইরূপ পরিজ্ঞাত বিষয় যত অধিক উৎকৃষ্ট হইবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানও তত অধিক উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক হইবে।

আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণেই সৃষ্টি মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং তিনি সমস্ত বিশ্বের বাদশাহ। বিশ্বের সমস্ত আশ্চর্য বস্তু তাঁহারই শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন। সুতরাং অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার মা'রিফাতের তুল্য উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক

হইতে পারে না। তাঁহার দীদার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দীদার আর নাই এবং আত্মা তাঁহার দীদার লাভের জন্যই উৎসুক। কারণ, যে উদ্দেশ্যে যে বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে সেজন্যই উহা উৎসুক হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত লাভের আগ্রহ নাই সে এমন পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যাহার আহারে ইচ্ছা নাই এবং রুটি অপেক্ষা মাটিই তাহার নিকট অধিক ভাল লাগে। চিকিৎসা করাইয়া এমন রোগীর মাটিভক্ষণের ইচ্ছা বিদূরিত করত আহারে রুচি পুনরায় জন্মাইতে না পারিলে সে দুনিয়াতে বড় হতভাগ্য এবং সে ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপ, যে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত অপেক্ষা অপর বস্তুর আগ্রহ অধিক সে হৃদয়ও পীড়াগ্রস্ত। এমন আত্মা দুর্ভাগা হইয়া পরকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

মা'রিফাতের অবিনশ্বর ঃ ভোগেচ্ছা ও পার্থিব বস্তুর সুখের সম্বন্ধ একমাত্র শরীরের সঙ্গেই থাকে। মৃত্যুকালে এই সম্বন্ধ আপনা-আপনিই ছুটিয়া যায় এবং সেই সমস্ত ভোগেচ্ছা ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে যত পরিশ্রম করে তাহাও ব্যর্থ হয়। অপর পক্ষে আল্লাহ্‌র মারিফাতের আনন্দ আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, মৃত্যুর পর ইহা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কারণ, আত্মা মরিবে না, এবং মারিফাত স্থায়ী থাকিবে, বরং মৃত্যুর পর আত্মা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তখন আত্মা দুনিয়ার মোহ ও রিপুসমূহের প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইয়া পাড়িবে; এইজন্যই মা'রিফাতের আনন্দ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের শেষভাগে 'পরিত্রাণ' খণ্ডে 'মহব্বত' অধ্যায়ে দেওয়া হইবে।

মানব-দেহের বৈচিত্র ঃ মানবাত্মা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহাই এ গ্রন্থে যথেষ্ট। কেহ ইহার অধিক জানিতে চাহিলে আমা কর্তৃক লিখিত 'আজায়েযুল কুলূব' গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই যে পূর্ণ আত্মপরিচয় লাভ হইবে, তাহা নহে। কারণ আত্মা পুরা মানুষের এক অংশ; অপর অংশ শরীর এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আত্মার গুণসমূহের কতকগুলি মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। দেহ-নির্মাণের মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য রহিয়াছে। মানুষের প্রতিটি বাহ্য অঙ্গ ও প্রতিটি আভ্যন্তরিক যন্ত্রের মধ্যে অসংখ্য বৈচিত্র্য ও অনন্ত কৌশল রহিয়াছে। মানব-দেহে বহু সহস্র শিরা, স্নায়ু ও অস্থিখণ্ড আছে। ইহাদের প্রতিটির আকৃতি ও গুণ বিভিন্ন প্রকার এবং প্রতিটির উদ্দেশ্য বিভিন্ন। তোমরা অনেকেই এই বিষয়ে অবগত নও। কেবল এতটুকু জান যে, ধারণ করিবার জন্য হস্ত, চলিবার জন্য পদ এবং বলিবার জন্য জিহ্বার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা দশটি পর্দা দিয়া চক্ষু তৈয়ার করিয়াছেন এবং দশটি পর্দা বিভিন্ন প্রকারের। এই দশটির মধ্যে শুধু একটির অভাব হইলে দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটে। এই সকল পর্দা কোন সৃষ্ট হইয়ছে এবং ইহাদের একটির অভাবে দৃষ্টিশক্তির কেন ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হয়ত তোমরা জান না। এখন ভাবিয়া দেখ, চক্ষু একটি বাহিরের অঙ্গ এবং এ সম্বন্ধে বহু বিদ্বান লোক অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় এই বাহ্য অঙ্গের অবস্থাও যখন সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পার না তখন হৃদপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, ফুসফুস প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি কেন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা না জানাতে কি বিস্ময়ের কারণ আছে? আমাদের ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পরিপক্ক হয় এবং উহাকে রক্তে পরিণত করত সমস্ত দেহের গঠন ও রক্ষণের উপযোগী করিবার জন্য হৃদপিণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডে রক্ত বিশোধিত হওয়ার সময় নিচে কিছু গাদ সঞ্চিত হয় এবং এই গাদ শ্লেষ্মায় পরিণত হয়। প্লীহা এই শ্লেষ্মা লইয়া ইহাকে একপ্রকার হরিদ্রবর্ণ ফেনায় পরিণত করে। ইহাই পিত্তরস। যকৃত এই পিত্তরস ছাঁকিয়া রক্তকে পরিষ্কার করে। হৃদপিণ্ড হইতে রক্ত বাহির হওয়ার সময় ইহাকে বিভিন্ন উপাদানের সমতা থাকে না এবং উহা খুব পাতলা থাকে। ফুসফুস হইতে পানি ছাঁকিয়া লয় এবং রক্ত তখন গাদ ও পিত্তরস হইতে বিমুক্ত সমতাপ্রাপ্ত হইয়া শিরায় শিরায় সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। যকৃতে পীড়া হইলে ইহা আর রক্ত ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিতে পারে না। এই কারণেই পাণ্ডুরোগ ও নানারূপ পিত্তরোগ জন্মে। প্লীহার কোন রোগ দেখা দিলে রক্তের সহিত গাদ থাকিয়া যায়। তখন ইহার রক্তের সহিত সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিয়া নানারূপ রোগের উৎপন্ন করে। ফুসফুসের কোন বিকার দেখা দিলে রক্তে পানি থাকিয়া যায় এবং এই কারণেই জলন্দর রোগের উৎপন্ন হয়। একই প্রকার মানবদেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র তা'আলা পৃথক পৃথক কার্যের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটির অভাব হইলেই সমস্ত দেহ বিগড়াইয়া যায়।

মানবদেহে বিশ্বজগতের নমুনা ঃ মানবদেহ ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমস্ত বিশ্বের নমুনা রহিয়াছে। বিশ্বজগতে যাহা আছে তৎসমুদয়ের নমুনা এই ক্ষুদ্র দেহে পাওয়া যায়। দেহের অস্থিখণ্ড জগতের পাহাড়তুল্য, ঘাম বৃষ্টিসদৃশ, লোমসমূহ বৃক্ষ, মস্তিষ্ক আকাশ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নক্ষত্ররাজি স্বরূপ। এই সকলের বিবরণ বহু বিস্তৃত। মোট কথা, জগতে যত প্রকার সৃষ্ট জীব আছে যেমন–শূকর, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ফেরেশতা প্রভৃতি জীবজন্তুর সাদৃশ্য মানব-শরীরে বিদ্যমান আছে। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। এমনকি, মানব– সমাজের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির নমুনাও মানব–শরীরে পাওয়া যায়। যে শক্তি পাকস্থলীতে ভূক্তদ্রব্য হজম করে তাহা বাবুর্চিতুল্য। যে শক্তি ভূক্তদ্রব্যকে রসে পরিণত করত হৃদপিণ্ড ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে পৌঁছাইয়া দেয় উহা তেলী সদৃশ। যে শক্তি পরিপক্ক রসকে হৃদপিণ্ডে লোহিতবর্ণ রক্তে পরিণত করে তাহাকে রংরজক বলা যাইতে পারে। যে শক্তি রক্তকে মাতৃস্তনে দুগ্ধে ও পুরুষের অণ্ডকোষে শ্বেতশুক্রে পরিণত করে তাহাকে ধোপা বলা চলে। যে শক্তি ভূক্ত দ্রব্য ও রক্তকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায় তাহাকে ভারবাহী মুটিয়া বলা যায়। যে শক্তি পানিকে ফুসফুস ও মুত্রনালী দিয়া প্রবাহিত করে, সে ভিস্তিতুল্য। যে ব্যক্তি

ভূক্তদ্রব্যের অসার ভাগ উদর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে, সে মেথরস্বরূপ। যে শক্তি শরীরকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিবার জন্য প্লীহা ও যকৃৎকে আপন আপন কার্য হইতে ক্ষান্ত করে তাহাকে ধ্বংসকারী প্রতারক বলা যায়। যে শক্তি পিত্তজনিত ও অন্যান্য রোগ বিদূরীত করে তাহাকে সম্ভ্রান্ত বিচারক বলা চলে এই সমস্তের বিরবণ বহু বিস্তৃত।

তোমার পরিচর্যায় বহু শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তুমি নিতান্ত মোহমুগ্ধ অবস্থায় গাফিল হইয়া রহিয়াছ, ইহা যেমন ভালরূপে বুঝিতে পার এইজন্য এতগুলি কথা বলা হইল। ঐ সকল শক্তি দিবারাত্র তোমার কাজে মশগুল আছে, ইহারা কখনও নিজ নিজ কার্যে অবহেলা করে না এবং অবসরও গ্রহণ করে না। তুমি তাহাদের খবরও জান না এবং যে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে তোমার কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করিতেছ না। অপর পক্ষে কোন ব্যক্তি যদি তাহার গোলামকে তোমার খেদমতে একদিনের জন্যও নিযুক্ত করে তবে সারাজীবন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাক। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তোমার দেহ রক্ষার্থে কত শত সহস্র খেদমতগার তোমার খেদমতের জন্যও নিযুক্ত রাখিয়াছেন এবং তাহারা তোমার জীবতাবস্থায় এক মুহূর্তের জন্যও তোমার খেদমত হইতে বিরত থাকে না তথাপি তুমি তাঁহার স্মরণ করিতেছ না।

শরীর বিদ্যা মা'রিফাতের এক পন্থা ঃ যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে শরীরের গঠন-প্রণালী ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকারিতা ও উপযোগিতা অবগত হওয়া যায় তাহাকে শরীর বিদ্যা বলে। ইহা এক বড় বিদ্যা। তথাপি ইহা শিখিতে লোকে বড় একটা ইচ্ছা করে না, কেহ শিখিলেও কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রে পটুতালাভের জন্যই শিখিয়া থাকে। চিকিৎসা-শাস্ত্র স্বয়ং অসম্পূর্ণ ও হাকীকতবিহীন। চিকিৎসা বিদ্যার আবশ্যকতা থাকিলেও ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র বিচিত্র শিল্প-কৌশল বুঝিবার উদ্দেশ্যে ইহা শিক্ষা করে তবে সে নিজে নিজেই আল্লাহ্‌র অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে তিনটি গুণ অবগত হইতে পারিবে। প্রথমত, এই কৌশলপূর্ণ মানব-দেহের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ পূর্ণ ক্ষমতাশীল। তিনি যাহা চাহেন তাহাই করিতে পারেন। তিনি যে এক বিন্দু শুক্র হইতে এই অত্যাশ্চর্য কৌশলময় মানবদেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় দুনিয়াতে আর কিছুই নাই। যিনি এক বিন্দু নির্জীব শুক্র হইতে এরূপ অত্যাশ্চর্য মানব-দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা তাহার পক্ষে অতি সহজ। দ্বিতীয়ত, সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ এত বড় জ্ঞানী যে, তাঁহার অসীম জ্ঞান সমস্ত বিশ্বজগত আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, এই আশ্চর্য কৌশলময় সৃষ্টি পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নহে। তৃতীয়ত, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, দান ও দয়ার সীমা নাই। কারণ, মানুষের জন্য যে সকল

জিনিস অত্যাবশ্যক– যাহা না হইলে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তৎসমুদয় তিনি দয়া করিয়া দান করিয়াছেনই, যেমন– হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ইত্যাদি। আবার মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য, তাহার আরামের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমুদয়ও তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ দান করিয়াছেন, যেমন– হস্ত, পদ, জিহ্বা, চক্ষু এবং অন্যান্য পদার্থ। শুধু উহাই নহে, বরং যাহা তাহার জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নহে এবং তাহার অভাব মিটাইবার জন্যও প্রয়োজনীয় নহে এমন কতকগুলি বস্তুও তিনি মানুষকে কেবল শোভাসৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রদান করিয়াছেন, যথা– কেশের কৃষ্ণতা, ওষ্ঠের রক্তিমা, ভ্রূযুগলের বক্রতা, নয়ন-পক্ষের সমতা প্রভৃতি। নর-নারী যেন এই সমস্ত গুণে বিভূষিত হইয়া সুন্দর দেখায়, এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তৎসমুদয় দান করিয়াছেন। দয়াময় আল্লাহ্র এই কৃপা শুধু মানব জাতির জন্যই সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও প্রাণীই আল্লাহ্ তা'আলার এই অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে এমনকি, মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও তিনি তাহাদের প্রয়োজনীয় এবং সৌন্দর্য ও শ্রীবর্ধক যাবতীয় বস্তু দান করিয়াছেন এবং উহাদিগকে নানাবিধ রঙ্গে বিভূষিত করিয়াছেন।

এই জন্যই মানবদেহের আকৃতি ও গঠন-ক্রিয়াতে আল্লাহর যে ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রযুক্ত হইয়াছে তৎপ্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করাকে তাহার গুণ- পরিচয়ের কুঞ্জী বলা হয়। এই কারণেই- শরীর- বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব। চিকিৎসকের ইহার আবশ্যকতা আছে বলিয়া ইহার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। যেরূপ কাব্যের সৌন্দর্য ও রচনার কৌশল এবং শিল্প- কার্যের বৈচিত্র যত অধিক অবগত হওয়া যায় ততই কবি ও শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে অনুভূতি হয় তদ্রূপ মানবদেহের বিচিত্র গঠন, অদ্ভুত নির্মাণ-কৌশল মনোযোগের সহিত দেখিলে নিপুণতম শিল্পী আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব উপলব্ধি করা চলে। এইজন্য শরীর বিদ্যা (Anatomy) আত্মদর্শনের এক উপায়।

শরীর-বিদ্যা অপেক্ষা আত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ ঃ কিন্তু আত্মবিদ্যার তুলনায় শরীরবিদ্যা অতি সংক্ষিপ্ত তুচ্ছ। কারণ, শরীর-বিদ্যায় কেবল দেহের বিবরণ জানা যায় এবং দেহ বাহনস্বরূপ ও আত্মা আরোহী সদৃশ। সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাহন নহে, বরং আরোহী। আরোহীর জন্যই বাহনের সৃষ্টি, বাহনের জন্য আরোহীর প্রয়োজন হয় না।

জগতের সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা তিনি নিজের তোমার অধিক নিকটবর্তী, তথাপি তুমি নিজকে উত্তমরূপে চিনিতে পার না–এই কথা তোমার বুঝাইবার জন্যই এতটুকু বলা হইল। যে ব্যক্তি নিজকে চিনে না, অথচ অপরকে চিনে বলিয়া দাবি করে সে এমন নিঃস্ব ব্যক্তিতুল্য যাহার নিজের আহার্যের সংস্থান নাই অথচ নগরবাসী সমস্ত দীন-দুঃখীদের আহার প্রদান করে বলিয়া দাবি করে তাহার এরূপ দাবি নিতান্ত বাজে ও আশ্চর্যের বিষয়।

আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-উন্নতিতে পরিশ্রম আবশ্যক ঃ এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিয়াছ। এখন বুঝিয়া লও যে, আল্লাহ্ তোমাকে এই অতি উত্তম পদার্থ দান করিয়াছেন এবং ইহাকে তোমা হইতে গোপনে রাখিয়াছেন। তুমি যদি ইহার পর্যবেক্ষণে অনুসন্ধান না কর, ইহাকে ধ্বংস করিয়া দাও এবং ইহা হইতে গাফিল থাক তবে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং পরিশ্রমের সহিত আত্মার অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে একেবারে নির্লিপ্ত করিয়া ইহাকে গৌরবের উচ্চতম সিংহাসনে আরোহণ করাও। তাহা হইলে পরকালে তোমার অনন্ত সৌভাগ্য ও অসীম সন্ধান প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ তখন তুমি অবিমিশ্র সুখ, অবিনশ্বর জীবন, অপ্রতিহত ক্ষমতা, সন্দেহশূন্য মারিফাত লাভ ও নির্মল সৌন্দর্য দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করিবে। আত্মা যদি পরকালে প্রকৃত সম্মান ও গৌরব লাভের উপযোগী হয় তবে ইহকালেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব থাকে। অন্যথায় মানবের ন্যায় অসহায় ও অসম্পূর্ণ আর কেহই নেই। কারণ, মানুষ এ সংসারে শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা ও যাতনায় বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। আবার যাহাতে তাহার তৃপ্তি ও আনন্দ তাহাই তাহার ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ এবং যাহা তাহার জন্য উপকারী তাহা দুঃখ ও তিক্ততাশূন্য নহে। জ্ঞান, ক্ষমতা, সংকল্প, ধৈর্য অথবা সৌন্দর্যের কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, মানুষ অপেক্ষা মূর্খ জগতে আর নাই। কেননা, তাহার মস্তিষ্কের একটি মাত্র রগ বক্র হইয়া পড়িলে সে উন্মাদ বা একেবারে ধ্বংস হইতে পারে। অথচ সে ইহার কারণও বুঝিতে পারে না এবং উপশমের উপায়ও সে জানে না। এমনও হয় যে, ঔষধ তাহার সম্মুখে বিরাজমান থাকে, অথচ সে তাহা চিনিতে পারে না। আবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিরাজমান থাকে, অথচ সে তাহা চিনিতে পারে না। আবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মানুষের ন্যায় দুর্বল আর কোন প্রাণীই নহে। একটি মাছিকেও সে পরাস্ত করিতে পারে না। আল্লাহ্ একটি মশাকে মানুষের বিপক্ষে নিযুক্ত করিলে ইহার নিকট সে পরাজিত হয়। একটি মৌমাছির ডাক শুনিয়া মানুষ ভীত ও অস্থির হয়।

তৎপর ধৈর্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ কণামাত্র কমতি সহ্য করিতে পারে না; সামান্যতম ক্ষতি হইলেও দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও পেরেশান হইয়া উঠে। ক্ষুধার সময় এক গ্রাস খাদ্য না পাইলে নিতান্ত অধৈর্য হইয়া পড়ে। মানুষ অপেক্ষা সংকীর্ণমনা আর কে আছে? পরিশেষে মানুষের সৌন্দর্য ও আকৃতির দিকে মনোনিবেশ করিলে বুঝা যায় যে, স্তূপীকৃত অপবিত্রতাকে চর্ম দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। মানুষ যদি দুই দিন নিজ শরীর ধৌত না করে তবে তাহার শরীর হইতে নিঃসৃত ময়লার দুর্গন্ধে সে নিজেই অতিষ্ট হইয়া পড়িবে ; তখন তাহার সমস্ত

শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। মানব-দেহ অপেক্ষা অধিক ময়লাযুক্ত আর কিছুই নাই। কারণ, ইহার ভিতরে সর্বদাই অপবিত্র মল-মূত্রাদি থাকে, আর এইগুলি বহন করিয়াই মানুষ চলে এবং প্রত্যহ নিজ হস্তে এই মলমূত্র ধৌত করে।

কাহিনী ঃ একদা হযরত শাইখ আবূ সাঈদ (র) সূফীগণের সহিত কোন স্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে দেখিতে পাইলেন, মেথরগণ পায়খানা পরিষ্কার করিতেছে। রাস্তায় কিছু মল পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং নাক বন্ধ করত অন্যদিকে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি সে স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "বন্ধুগণ, বুঝিয়া বলত, এই ময়লা আমাকে কি বলিতেছে?" তাঁহার উত্তর করিলেনঃ "হযরত, কি বলিতেছেন আপনি বলিয়া দিন।" তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ "ময়লা বলিতেছে–গতকল্য আমরা বাজারে নানাবিধ উপাদেয় ফলমূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি আকারে দোকানে বিরাজ করিতেছিলাম। লোকে আমাদিগকে ক্রয় করিবার জন্য রাশি রাশি টাকা-পয়সা লুটাইতেছিল। এক রাত্র মাত্র আমরা তোমাদের উদরে ছিলাম। ইহাতেই আমরা দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছি। এখন ভাবিয়া দেখ, তোমাদের নিকট হইতে আমাদের পলায়ন করা উচিত, না আমাদের নিকট হইতে তোমাদের পলায়ন করা উচিত?"

মানবের উন্নতির উপায় ঃ প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ এ দুনিয়াতে নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ, অত্যন্ত অক্ষম ও বড়ই অসহায়। কিয়ামতের দিন ইহা উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। কিন্তু সৌভাগ্যের পরশমণিকে স্বীয় আত্মার উপর বারবার ঘর্ষণ করিতে থাকিলে মানুষ ইতর প্রাণীর শ্রেণী অতিক্রম করিয়া ফেরেশতার মরতবায় উন্নীত হইতে পারিবে। অপর পক্ষে দুনিয়া ও দুনিয়ার লোভ-লালসায় নিবিষ্ট থাকিলে কিয়ামতের দিন মানুষ কুকুর ও শূকর হইতে নিকৃষ্ট হইবে; কারণ কুকুর ও শূকর সেই দিন মাটিতে মিশিয়া গিয়া দোযখের আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে; কিন্তু মানুষ নিজ কর্মদোষে আযাবে নিপতীত থাকিবে। মানুষ যখন নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবগত হইল তখন নিজের দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা ও অসহায়তা সম্বন্ধেও তাহার অবগত থাকা আবশ্যক। কারণ, এইরূপ আত্মপরিচয় আল্লাহ্‌র মারিফাত লাভের অন্যতম উপায়।

আত্ম-পরিচয়ের জন্য যাহা বলা হইল তাহাই এগ্রন্থে যথেষ্ট। এ স্থলে ইহার অধিক বর্ণনা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ-পরিচয় (তত্ত্বদর্শন)

আল্লাহ্-পরিচয়ের জন্য আত্ম-পরিচয়ের আবশ্যকতা ঃ পূর্বকালের পয়গম্বর (আ)-গণের কিতাবে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ ـ

অর্থাৎ ঃ "তুমি আত্ম-পরিচয় লাভ কর ঃ তাহা হইলে আল্লাহ্‌র পরিচয় পাইবে।"

এ সম্বন্ধে পূর্বকালের বুযর্গগণের উক্তি মশহুর আছে ঃ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ ـ

অর্থাৎ " যে ব্যক্তি নিজকে চিনিয়াছেন তিনি আল্লাহ্‌কে চিনিয়াছেন।"

এ সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, মানবাত্মা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। মনোযোগের সহিত স্বীয় আত্মার প্রতি লক্ষ্য করিলে আল্লাহ্‌র পরিচয় পাওয়া যায়। বহু লোক স্বীয় আত্মার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রকৃত আত্ম-পরিচয় লাভ করা আবশ্যক; কেননা ইহা আল্লাহ্‌র- পরিচয় লাভের আয়নাস্বরূপ।

আত্ম-পরিচয়ের দুইটি উপায় আছে। তন্মধ্যে একটি নিতান্ত কঠিন। অধিকাংশ লোক ইহা বুঝিতে পারে না এবং যাহা অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে অক্ষম তাহা বর্ণনা করাও সঙ্গত নহে। যে উপায়ে সকলের বোধগম্য হয় তাহাই বর্ণনা করা উচিত এবং তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী বুঝিবার সহজ উপায় ঃ মাবন নিজের অস্তিত্ব দেখিয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে; স্বীয় গুণ দেখিয়া আল্লাহ্‌র গুণ চিনিয়া লইবে এবং স্বীয় দেহ-রাজ্যের উপর তাহার যে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা চলে তাহা হইতে সমস্ত বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে।

(১) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পরিচয় ঃ মানুষ স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে যে, কয়েক বৎসর পূর্বে তাহার নাম ও নিশানা কিছুই ছিল না। এই

সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ـ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই মানুষের উপর কালের এমন একটি অংশ অতিবাহিত হইয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না। নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষকে সম্মিলিত শুক্র-বিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। তৎপর তাহাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী বানাইয়াছি।"

প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ এক বিন্দু নাপাক শুভ্র শুক্রমাত্র ছিল। ইহাতে বুদ্ধি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, মস্তক, হস্ত-পদ, জিহ্বা, চক্ষু, স্নায়ু, অস্থি, গোশ্ত, চর্ম কিছুই ছিল না। অতঃপর ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আশ্চর্য কৌশলপূর্ণ, যন্ত্রসমূহ ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। মানুষ নিজ দেহ নিজে সৃষ্টি করে নাই; বরং অপর কোন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, এখন সে পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হইয়াও এক গাছি কেশ পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারে না। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, একবিন্দু শুক্ররূপে থাকাকালে মানুষ কত দুর্বল ও অক্ষম ছিল। এমতাবস্থায় নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সে নিজে কিরূপে তৈয়ার করিবে? সুতরাং মানুষ নিজের প্রাথমিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে আপনা-আপনিই বুঝিতে পারে যে, এক মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা তাহাকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করিয়াছেন। অতএব, মানুষ নিজ অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া আল্লাহ্র অস্তিত্ব বুঝিতে পারে।

(২) আল্লাহ্র গুণাবলীর পরিচয় ঃ আল্লাহ্র ক্ষমতা– মানুষ স্বীয় বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির আশ্চর্য গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিলে আল্লাহ্র ক্ষমতা বুঝিতে পারে এবং জানিতে পারে যে, তাঁহার ক্ষমতা অনন্ত। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ চাহেন সেইরূপই সৃষ্টি করেন। তিনি এমন পূর্ণ ক্ষমতাশালী যে, এক বিন্দু নিকৃষ্ট শুক্র হইতে কেমন পূর্ণ সৌন্দর্যসম্পন্ন ও কৌশলপূর্ণ বিস্ময়কর মানব-দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ্র অপরিসীম জ্ঞান ঃ মানব যখন নিজের গুণাবলী ও স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তাহার প্রত্যেকটি বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যথা-হস্ত, পদ, চক্ষু, জিহ্বা, দন্ত ইত্যাদি এবং প্রত্যেকটি আভ্যন্তরিক যন্ত্র, যথা– হৃদপিণ্ড, যকৃত, প্লীহা প্রভৃতিকে আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন তখন সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম জ্ঞানের সন্তান লাভ করে; জানিতে পারে তাঁহার জ্ঞান কত পূর্ণ ও কত ব্যাপক। বিশ্বজগতের সকল বস্তুই তাঁহার জ্ঞানের

অন্তর্গত, কোন পদার্থই তাঁহার জ্ঞান কত পূর্ণ ও কত ব্যাপক। বিশ্বজগতের সকল বস্তুই তাঁহার জ্ঞানের অন্তর্গত, কোন পদার্থই তাঁহার জ্ঞানের বহির্ভূত নহে; বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদিগকে যদি বলা হয় আল্লাহ্ যে প্রণালীতে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সৃজন ও সংযোজন করিয়াছেন তোমরা তোমাদের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান খাটাইয়া তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর প্রণালী বাহির কর এবং এই কার্য সমাধা করিতে যদি তাহাদিগকে অসীম আয়ুও দেওয়া হয় তথাপি তাহারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী বাহির করিতে পারিবে না। দেখ, আল্লাহ্ দন্তপাটিকে কেমন সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। খাদ্য-দ্রব্য কর্তনের জন্য পার্শ্বের দাঁতগুলিকে চওড়া করিয়াছেন। দাঁতের নিকটেই জিহ্বা অবস্থিত থাকিয়া জাঁতার মধ্যে শস্য-নিক্ষেপকারী যন্ত্রের ন্যায় কার্য করে। জিহ্বার নিচের লালারস নির্গমনকারী শক্তি ছানা নির্মাণকারী এবং আটাতে পানি-সিঞ্চনকারীর ন্যায় কার্য করিয়া থাকে। এই শক্তি আবার চর্বিত দ্রব্যকে ভিজাইয়া সহজে গলধঃকরণের উপযুক্ত লালারস সরবরাহ করে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানীব্যক্তি একত্রিত হইয়া গবেষণা করিলেও আল্লাহ্ যে প্রণালীতে দন্তপাটি ও জিহ্বাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

তদ্রূপ, হাতে পাঁচটি আঙ্গুল আছে। তন্মধ্যে চারিটি এক প্রকার এবং এক অঙ্গুষ্ঠ একাকী উহাদের হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ও দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র। তথাপি ইহা সকল আঙ্গুলির সহিত কাজ করে ও সকলের উপর ঘুরিতে পারে। সকল আঙ্গুলেই তিনটি করিয়া গ্রন্থি আছে; কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে মাত্র দুইটি। অঙ্গুলিগুলি এই পদ্ধতিতে সৃষ্ট ও স্থাপিত বলিয়া ইহাদের সাহায্যে সহজেই কোন বস্তু ধারণ ও উত্তোলন করা চলে, কোষ বানাইয়া পানপ্রাত্ররূপে ব্যবহার করা চলে এবং হস্ত তালুকে সম্প্রসারণপূর্বক আরও বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সমস্ত বিশ্বের জ্ঞানিগণ মিলিত হইয়া যদি আঙ্গুলগুলিকে অন্যরূপে সাজাইবার প্রস্তাব করত বলে যে, পাঁচটি আঙ্গুলই সমান করা হউক, কিংবা তিনটি এক দিকে ও দুইটি অপর দিকে থাকুক, অথবা পাঁচটির পরিবর্তে ছয়টি বা চারটি গ্রন্থি হউক–এইরূপ যে কোন পরিবর্তনই করা হউক না কেন, সর্বত্রই দেখা যাইবে ইহা ত্রুটিপূর্ণ ও অসুবিধাজনক এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্ যে পদ্ধতিতে সৃজন করিয়াছেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র জ্ঞান জগতের সমস্ত বস্তুকে ঘিরিয়া আছে এবং তিনি সমস্ত অবগত আছেন। মানব-দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই ঐ প্রকার আশ্চর্য আশ্চর্য কৌশল রহিয়াছে। যে ব্যক্তি এই সমস্ত যত অধিক অবগত সে আল্লাহ্র জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও অসীমতা বুঝিতে পারিয়া ততই বিস্ময়াপন্ন হইবে।

আল্লাহ্‌র অনন্ত দয়া ঃ মানুষ স্বীয় প্রয়োজন ও অভাবের দিকে লক্ষ্য করিলে সর্বপ্রথমেই বুঝিবে যে, সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষী। তৎপর সে পানাহার, বস্ত্র ও বাসগৃহের আবশ্যকতা অনুভব করিবে। ইহার পর দেখিবে-খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতে পানি, বায়ু, শীত-গ্রীষ্মের প্রয়োজন। আবার খাদ্যদ্রব্যসমূহ আহারের উপযোগী করিতে নানাবিধ শিল্প-কর্মের আবশ্যক। সে-সকল শিল্পের জন্য আবার লৌহ, তামা, পিতল, সীসার প্রয়োজন। পুনরায় দেখা যাইবে যে, এই সকল ধাতু হইতে কিরূপে যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে হয় তাহাও শিক্ষা করা দরকার।

আমাদের সর্বপ্রকার অভাব পূরণের উপাদান সামগ্রী আল্লাহ্ পূর্বেই প্রয়োজনমত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি উপাদান-সামগ্রী পূর্বেই তৈয়ার করিয়া না রাখিলে বা ইহাতে গুণ ও উপযোগিতা অগ্রেই সংযোজন করিয়া না দিলে লোকে স্বীয় অভাব দূর করিবার যন্ত্রাদি তৈয়ার করিতে পারিত না; এমন কি কিরূপে সেই অভাব দূর হইবে, তাহার কল্পনাও করিতে পারিত না। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই সমস্তই মানুষের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র অযাচিত দান। একমাত্র অনুগ্রহ ও মেহেরবানিপূর্বক এ সকল বস্তু আল্লাহ্ মানুষকে দান করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র এই গুণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার অনন্ত দয়া বিশ্বের সকল পদার্থের উপরই ব্যাপক এবং এই ব্যাপক দয়ার অপর একটি নিদর্শন হইল মানব-জাতির মধ্যে ওলী ও নবীর আবির্ভাব। এই মর্মেই হাদীসে কুদ্‌সিতে আছে ঃ

سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰى غَضَبِيْ -

"আমার (রাল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।"

রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও এ-সম্বন্ধে বলেন ঃ "দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতি জননীর স্নেহ অপেক্ষা বান্দার প্রতি করুণাময় আল্লাহ্‌র স্নেহ অধিক।"

মোটকথা, নিজ অস্তিত্ব হইতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব জানা গেল এবং মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়া আল্লাহ্‌র পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-কার্যে আশ্চর্য কৌশল এবং উহাদের উপকারিতা দর্শনে তাঁহার অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল। যে-সকল বস্তু আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, যেগুলি আমাদের আরাম ও সুখদায়ক এবং যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, এই সমস্তই তিনি অযাচিতভাবে দান করিয়াছেন। এই সকল পর্যালোচনা করিলে আল্লাহ্‌র অপার স্নেহ অপরিসীম দয়া অবগত হওয়া যায়। এই প্রকার আত্মদর্শনই আল্লাহ্‌র মারিফাত লাভের কুঞ্জী।

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঃ মানুষ যেমন নিজ গুণ দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পরিচয় পাইল এবং আপন অস্তিত্ব দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বুঝিতে পারিল, তদ্রূপ স্বীয় পবিত্রতা

দ্বারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারে। আল্লাহ্‌র পবিত্রতার অর্থ এই যে, তাঁহার গুণাবলী চিন্তা করিতে গেলে যাহা কিছু কল্পনায় আসে তিনি উহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে। যদিও বিশ্বজগতের কোন স্থানই তাঁহার জ্ঞান ও ক্ষমতার বহির্ভূত নহে তথাপি কোন বিশেষ স্থানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নহে। এইরূপ পবিত্রতার প্রত্যঙ্গ আত্মার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হয়। আত্মা সমস্ত দেহের বাদ্‌শাহ। তদ্রূপ আল্লাহ্‌ও কোন এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন; তথাপি সমস্ত বিশ্ব-চরাচর তাঁহার পরিচালনাধীনে রহিয়াছে।

আত্মার প্রকৃত অবস্থা ও গূঢ়তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতার সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কিন্তু উহা করিবার অনুমতি নাই এবং আত্মার গূঢ়তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিলেই ঃ

اِنَّ اللّٰه خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ -

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন) বাক্যের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইবে।

(৩) আল্লাহ্‌র কার্যাবলীর পরিচয় ঃ উল্লিখিত বর্ণনা হইতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণ অবগত হইয়াছে, তিনি যে 'কি-কেমন-কি প্রকার?' তর্কের বহির্ভূত তাহাও বুঝিতে পারিয়াছে; তিনি যে কোন এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন তাহাও বুঝিয়া লইয়াছে এবং ইহাও জানা গেল যে, আত্ম-পরিচয় আল্লাহ্‌র পরিচয়ের কুঞ্জী। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ সম্পর্কীয় একটি অধ্যায় এখনও বর্ণিত হয় নাই। এ অধ্যায়ে বর্ণনার বিষয় হইল– সমস্ত বিশ্বজগতের উপর আল্লাহ্‌র বাদশাহী কিরূপে চলিতেছে, ফেরেশতাগণের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ প্রেরণ ও ফেরেশতাগণ কর্তৃক আল্লাহ্‌র আদেশ প্রতিপালন ফেরেশতাগণ দ্বারা কার্য সম্পাদন, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আদেশ প্রেরণ, আকাশ ও গ্রহনক্ষত্রাদির পরিচালন, আকাশের সহিত জগদ্বাসীর কার্যের সম্বন্ধ স্থাপন এবং তাহাদের জীবিকার 'কুঞ্জী' আসমানের যিম্মায় সমর্পণ প্রভৃতি। আল্লাহ্‌র মারিফাতের ইহা একটি বড় অধ্যায়। পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলিকে যেমন– অস্তিত্ব-দর্শন ও গুণ-দর্শন বলা হয় তদ্রূপ এইগুলিকে ক্রিয়া দর্শন বলা হইয়া থাকে। আত্ম-দর্শন ক্রিয়া-দর্শনেরও কুঞ্জী।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রভাব প্রকাশের ক্রমিক ধারা ঃ তোমার দেহ-রাজ্যের উপর তোমার বাদশাহী ও প্রভুত্ব কিরূপে চলিতেছে, ইহা তুমি অবগত না হইলে বিশ্বজগতের একমাত্র বাদশাহ আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে স্বীয় বিশাল রাজ্য চালাইতেছেন, তাহা কখনও তুমি বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং প্রথমেই তুমি নিজকে চিন এবং তোমরা প্রত্যেকটি কাজ সম্বন্ধে অবগত হও। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, তুমি

'বিসমিল্লাহ্' শব্দটি কাগজে লিখিতে চাও। প্রথমে লেখার ইচ্ছাটি তোমার মধ্যে উদিত হয়। তৎপর হৃদয়ে এক প্রকার আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তোমার বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে 'দিল' নামক যে একখণ্ড গোশ্ত আছে ইহাতে এই আলোড়নের সৃষ্টি হয় না। বরং হৃদপিণ্ড হইতে এক প্রকারের অতি সূক্ষ্ম পদার্থ উহাকে আলোড়িত করিয়া মস্তিষ্কের দিকে ছুটিয়া যায়। দেহতত্ত্ববিদগণ এই সূক্ষ্ম পদার্থকে রূহ বা জীবন বলেন। এই জীবনই সর্বপ্রকার অনুভব ও গতিবিধির শক্তি বহন করিয়া থাকে। এই জীবন পূর্ববর্ণিত আত্মা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা জীব-জন্তুর মধ্যেও আছে। ইহা মৃত্যুর অধীন। অপর পক্ষে আত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ; জীব-জন্তুর মধ্যে ইহা নাই এবং ইহা অমর। কারণ, কেবল এই আত্মাই আল্লাহ্র মারিফাতের স্থান। যাহা হউক, সেই জীবনী–শক্তি মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া ইহার প্রথম কুঠরি কল্পনার স্থানে 'বিসমিল্লাহ্' শব্দের আকৃতি উৎপন্ন করে। তাহার পর মস্তিষ্ক হইতে এক প্রকার ক্রিয়াশক্তি স্নায়ু পথে অঙ্গুলির অগ্রভাগে উপস্থিত হয়। মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া স্নায়ুসকল শরীরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং উহার কতকগুলি সূত্রবৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। ক্ষীণ ব্যক্তির বাহুতে ঐ প্রকার স্নায়ু-সূত্র বাহির হইতেই দেখা যায়। মোটকথা, মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত সেই ক্রিয়াশক্তি স্নায়ুগুলিকে, স্নায়ুগুলি আবার অঙ্গুলির অগ্রভাগকে এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ কলমকে চালিত করে ফলে চক্ষের সাহায্যে মস্তিষ্কের খেয়াল-কুঠরিতে পূর্ব হইতে অঙ্কিত ছবির অনুরূপ 'বিসমিল্লাহ্' লিখিত হয় এই কার্যে দর্শনশক্তির আবশ্যকতা অত্যধিক।

মানবের প্রত্যেক কার্যের প্রথমে ইহার ইচ্ছা যেমন তাহার মনে উদিত হয় তদ্রূপ আল্লাহ্র প্রত্যেক কার্যের আরম্ভও তাঁহার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় গুণের মধ্যে হইয়া থাকে; লিখিবার ইচ্ছা যেমন প্রথমে তোমার মনে উদ্ভব হইয়া ক্রমে তদ্পথে অন্যান্য স্থানে পৌঁছিয়াছিল, সেইরূপ আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে আরশে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে অন্যান্য স্থানে পৌছিয়া থাকে। তেজসদৃশ যে সূক্ষ্ম পদার্থ তোমার ইচ্ছার প্রভাবকে হৃদ্পিণ্ডের স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া থাকে উহাকে যেমন জীবনী-শক্তি বলা হয় তদ্রূপ আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রভাবকে যে পরম শক্তি আরশ হইতে কুর্সী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া থাকে উহাকে ফেরেশতা ও রুহুল কুদ্দুস বলা হয়। হৃদপিণ্ডের প্রভাব যেমন মস্তিষ্কে সংক্রামিত হয় এবং মস্তিষ্ক হৃদপিণ্ডের শাসনে ও আজ্ঞাধীনে পরিচালিত তদ্রূপ আল্লাহ্র নমুনা মানুষ নিজের মধ্যেও দেখিতে পায়। কারণ, প্রাণের মূল যাহাকে আমরা দিল বা রূহ্ বলি তাহাও মানব-কল্পনার অতীত। ইহাকে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে যত প্রকারের আকার ও গুণাবলী মানুষের কল্পনায় উদিত হয়, আত্মা উহার সবকিছু হইতেই পবিত্র। কেননা, আত্মার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ কিছুই নাই এবং ইহা বিভাজ্যও নহে। যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই এবং যাহা বিভক্তও হইতে পারে না তাহার কোন বর্ণ থাকাও অসম্ভব। যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই এবং যাহা অবিভাজ্য তাহা

কল্পনায়ও উদিত হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু বা যাহার সমজাতীয় বস্তু চক্ষু দেখিতে পায় কেবল তাহাই কল্পনায় আসে। বর্ণ ও আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই কল্পনাও দৃষ্টিপথে উদিত হয় না। 'অমুক জিনিস কেমন?' এই প্রশ্নের উত্তরে লোকে ইহাই মনে করে যে, সেই জিনিসের আকৃতি ও বর্ণ কি প্রকার– ছোট কি বড়। যে জিনিসের আকৃতি, বর্ণ ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্ব নাই তৎসম্বন্ধে 'ইহা কি প্রকার' এরূপ প্রশ্ন করা বৃথা। যে পদার্থে 'কি প্রকার' প্রশ্নের অধিকার নাই তাহা জানিতে চাহিলে স্বীয় আত্মার দিকে লক্ষ্য কর। দেখিবে, একমাত্র আত্মাই আল্লাহ্র মারিফাতের স্থান– ইহা বিভক্ত হয় না; ইহার আকার– প্রকার, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও বর্ণ কিছুই নাই। 'আত্মা কি প্রকার পদার্থ– এ প্রশ্ন কেহ করিলে ইহাই উত্তর হইবে যে, ইহাতে এমন প্রশ্নের কোন অধিকার নাই। তুমি যখন স্বীয় আত্মাকে ধারণা ও কল্পনার অধিকারমুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিবে তখন ইহা ভালরূপেই বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহ্র আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণাদি প্রভৃতি বাহ্য গুণাবলী হইতে আরও বহুগুণে পবিত্র।

অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবে যে, এমন আকৃতি-প্রকৃতিবিহীন বস্তু কিরূপে বিরাজমান থাকিতে পারে? তাহারা নিজ আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখে না যে, ইহা আকার-প্রকারবিহীন অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মানব নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সহস্র রকমের আকার-প্রকারবিহীন বস্তু দেখিতে পাইবে বেদনা, ক্রোধ, প্রেম, আস্বাদ ইত্যাদি সহস্র প্রকার নিরাকার বস্তু তাহার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ এই সমস্ত কি, কেমন, কি প্রকার– জানিতে চাহিলে সে কখনও জানিতে পারিবে না। কারণ, ইহাদের বর্ণ বা আকার কিছুই নাই। ক্রোধাদি নিরাকার গুণগুলিতে যেমন 'কেমন'? কি প্রকার? প্রশ্নের অধিকার নাই, অথচ ইহারা বিদ্যমান আছে তদ্রূপ আরও এমন বহু বস্তু মৌজুদ আছে যাহাতে ' কেমন?' ও 'কি প্রকার?' প্রশ্ন করা চলে না। শত চেষ্টা করিলেও শব্দ, আস্বাদ বা গন্ধের মূলতত্ত্ব কেহই অবগত হইতে পারিবে না। কারণ, ' কেমন?' কি প্রকার?' প্রশ্নগুলি খেয়ালের অধীন। দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত উহা অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং বস্তুটি ' কেমন? কি প্রকার?' এই সকল প্রশ্নের উত্তর একমাত্র দর্শনের পর খেয়ালে সঞ্চিত জ্ঞান হইতেই দেওয়া যাইতে পারে। যে বস্তুর উপর কর্ণের অধিকার আছে তাহাতে চক্ষের কোন অধিকার নাই; যেমন কর্ণ শব্দ শ্রবণ করে, চক্ষু শ্রবণ করে না। বরং শব্দের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, কর্ণ দ্বারা যেমন বর্ণ ও আকৃতি অবগত হওয়া যায় না। চক্ষুর দ্বারাও তদ্রূপ শব্দ বুঝা যায় না। এইরূপ, যে বস্তু অন্তরে অনুভূত হয় এবং বুদ্ধিতে বুঝা যায়, বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি তাহা অনুভব করিতে ও বুঝিতে পারে না। চক্ষু, কর্ণ ইন্দ্রিয়গুলি কেবল জড়পদার্থের আকার- প্রকার, অবস্থা বুঝিতে পারে, জড়াতীত পদার্থের উপর এই সকল ইন্দ্রিয়ের কোনই অধিকার নাই। এই সমস্ত কথা গভীর চিন্তার বিষয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দর্শনশাস্ত্রে আছে। এ স্থলে যতটুকু বলা হইল, ইহাই এ গ্রন্থে যথেষ্ট।

উক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মানবাত্মা যেমন কল্পনা ও ধারণার বহির্ভূত, ইহা অনুভব করত আল্লাহ্ কল্পনা ও ধারণার ততোর্ধ্বে তাহা বুঝিয়া লইবে। আর ইহাও বুঝিয়া লইবে যে, আত্মা যেমন দেহের মধ্যে বাদশাহস্বরূপ বিরাজ করিতেছে এবং দেহ ও দেহস্থিত সমস্ত আকার বিশিষ্ট পদার্থ আত্মার আজ্ঞাধীনে চলিতেছে, অথচ আত্মা নিরাকার তদ্রূপ বিশ্বজগতের বাদশাহ্ আল্লাহ্ স্বয়ং নিরাকার হইয়াও এই জড়ময় বিশ্বজগত চালাইতেছেন।

আল্লাহ্র পবিত্রতার ব্যাখ্যা অন্য প্রকারেও হইতে পারে। আল্লাহ্ কোনও এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন। মানবাত্মাও কোন এক বিশেষ অঙ্গে আবদ্ধ নহে। আত্মা না হস্তের মধ্যে, না পদে, না মস্তকে, না দেহের অন্য কোন বিশেষ অঙ্গে বিরাজমান আছে, বরং দেহের সকল অঙ্গেই আত্মা বিরাজমান রহিয়াছে। দেহের প্রত্যেক অঙ্গই বিভক্ত হইতে পারে; কিন্তু আত্মা বিভক্ত হইতে পারে না। আর অবিভাজ্য বস্তু বিভাজ্য বস্তুতে সমাবেশ হইতে পারে না। কারণ, যদি সমাবেশ হইতে পারিত তবে বিভাজ্য বস্তুর সহিত উহাও বিভক্ত হইয়া পড়িত। আত্মা কোন অঙ্গের সহিত আবদ্ধ না থাকিলেও দেহের কোন অঙ্গই আত্মার ক্ষমতা বহির্ভূত নহে। বরং সমস্ত অঙ্গ অভিপ্রায়ের প্রভাব প্রথমে আরশে উৎপন্ন হইয়া পড়ে কুর্সীতে বিস্তারিত হয় বলিয়া কুর্সী আরশের আজ্ঞাধীন। মানুষ যে কাজ করিতে ইচ্ছা করে তাহার ছবি পূর্ব হইতেই মস্তিষ্কের খেয়াল কুঠরিতে অঙ্কিত থাকে এবং পরে তদনুযায়ী কার্যসম্পন্ন হয়। যে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি লেখা তোমার উদ্দেশ্য ছিল তাহার ছবি পূর্ব হইতেই তোমার মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছিল। লেখা হইয়া গেলে দেখা যায় যে, লিখন মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছবির ন্যায়ই হইয়া থাকে। এই প্রকার যাহা কিছু এ জগতে প্রকাশ পায় উহার ছবিও পূর্ব হইতেই লওহে মাহফূজে অঙ্কিত থাকে। যে সূক্ষ্ম শক্তি তোমার মস্তিষ্কে থাকিয়া স্নায়ু সকলকে আলোড়িত করে এবং তদ্সাহায্যে হাতের অঙ্গুলী ও অবশেষে কলম পরিচালিত করে তদ্রূপ এক প্রকার শক্তি আরশ ও কুর্সীতে অবস্থিত থাকিয়া আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে পরিচালিত করে এবং ইহাদের প্রভাব নিম্নজগত পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রকৃতিকে আলোড়িত করে। শেষোক্ত শক্তিকে ফেরেশতা বলে।

পার্থিব প্রকৃতি চারি প্রকার, যথা– উষ্ণতা, শীতলতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা। কলম যেমন কালিকে আলোড়িত, বিক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত করিলে 'বিসমিল্লাহ্' শব্দ লিখিত হয়, উষ্ণতা ও শীতলতা তদ্রূপ পানি, মাটি ও অন্যান্য উপাদানকে আলোড়িত বিক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত করিলে দৃশ্যমান আকৃতি সকল গঠিত হয়। কলমের সাহায্যে কাগজের উপর কালি ছড়াইয়া দিলে কাগজ যেমন সেই কালি চোষণ করে তদ্রূপ আর্দ্রতা জড়পদার্থের মূল উপাদানসমূহকে ভিজাইয়া উহার সাহায্যে আকৃতি গঠন করিলে শুষ্কতা সেই আকৃতি রক্ষা করে। পদার্থসকল যাহাতে নিজ নিজ আকৃতি পরিত্যাগ করিতে না

পারে, এইজন্যই শুষ্কতা সর্বদা প্রহরীর ন্যায় কাজ করে। তরলতা না থাকিলে আকৃতি গঠিত হইতে পারিত না; আবার শুষ্কতা না থাকিলে মূর্তি সকলের আকৃতি রক্ষা পাইত না। কলম আপন গতিবিধি ও কার্য শেষ করিলে যেমন দেখা যায় যে পূর্ব হইতে চক্ষুর সাহায্যে মস্তিষ্কে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় 'বিসমিল্লাহ্' শব্দ লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ উষ্ণতা ও আর্দ্রতা কর্তৃক জড়পদার্থের অন্যান্য উপাদানগুলি আলোড়িত হইলে ফেরেশতাগণের সাহায্যে এ জগতে লওহে মাহফূজে অঙ্কিত ছবির ন্যায় প্রাণী ও উদ্ভিদের মূর্তি গঠিত হয়।

প্রত্যক্ষ ইচ্ছার প্রভাব যেমন প্রথমে তোমার মনে আরম্ভ হইয়া ক্রমে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তারিত হয়, সেইরূপ জড়জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনার মূল আল্লাহ্র ইচ্ছা আরশে সূত্রপাত হয়। ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে মনে গৃহীত হয়। তৎপর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য লোকে মনকে তোমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, তুমি মনে বাস করিয়া থাক। তদ্রূপ সকলের উপর আল্লাহ্র প্রভুত্ব যখন আরশের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তখন লোকে মনে করে আল্লাহ্ আরশে অবস্থান করেন। মনের উপর তুমি প্রবল হইয়া বসিলে দেহ- রাজ্যের সমস্ত কার্য যেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে, তদ্রূপ আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি হইতেই আরশের উপর প্রবল প্রভু হইয়া বসিলেন ও আরশ আল্লাহ্র সমস্ত অভিপ্রায়ের অধীন হইয়া পড়িল তখন বিশ্বজগতের সমস্ত কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে লাগিল। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ -

অর্থাৎ "তৎপর আরশকে আল্লাহ্ নিজ আধিপত্যের অধীন করিলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।" তিনিই সকল কাজের সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

মানবদেহে আল্লাহ্র রাজ্যের নমুনা ঃ উপরে যাহা বর্ণিত হইল তদ্সমুদয়ই সত্য। চক্ষুষ্মান সাধক ওলিগণ কাশ্ফের দ্বারা উহা অবগত হইয়াছেন এবং যথার্থই তাঁহারা জানেন যে, আল্লাহ্ আদমকে নিজের অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, বাদশাহ্কে বাদশাহ ব্যতীত অপর কেহই চিনিতে পারে না। আল্লাহ্ তোমাকে তোমার দেহ-রাজ্যের বাদশাহ্ করিয়া না বানাইলে এবং তাঁহার স্বীয় মহাসাম্রাজ্যের এক সংক্ষিপ্ত নমুনা তোমাকে দান না করিলে তুমি বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ্কে কখনই চিনিতে পারিতে না। অতএব যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাকে বাদশাহের মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং স্বীয় রাজ্যের নমুনাস্বরূপ তোমাকে একটি রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেই বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র নিকট তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তোমার দিল

আরশতুল্য, দিল হইতে নিঃসৃত তোমার জীবনী-শক্তি ইসরাফীলসদৃশ; এইরূপ মস্তিষ্ক–কুর্সী; মস্তিষ্কের খেয়াল-কুঠরি-লওহে মাহফূজ; চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি– ফেরেশতা; মস্তিষ্কের বহির্গত হইয়া সর্বদেহে পরিব্যপ্ত হইয়াছে, সেই বিন্দু সকল গ্রহ-নক্ষত্র; অঙ্গুলী, কলম ও কালি প্রকৃতিস্বরূপ। আল্লাহ্ তোমার আত্মাকে কল্পনাতীত ও নিরাকাররূপে সৃষ্টি করিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর বাদশাহ্ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন ঃ "খবরদার, স্বীয় অস্তিত্ব ও বাদশাহী ভুলিও না। ভুলিলে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে ভুলিয়া ফেলিবে।" এইজন্যই বলা হইয়াছে– "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে তাহার আকৃতির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, হে মানব, নিজকে চিন। তাহা হইলেই তোমার প্রভু আল্লাহ্কে চিনিবে।"

আত্ম-জ্ঞান ও বিশ্ব-জ্ঞান ঃ দেহ-রাজ্যে মানুষের প্রভুত্বের সহিত বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র বাদশাহীর তুলনা করিতে গিয়া দুইটি প্রধান জ্ঞানের আভাস দেওয়া হইল। প্রথম, মানুষের আত্মজ্ঞান-মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত উহার বিবিধ শক্তি ও গুণাবলীর সম্বন্ধ এবং এই সকল শক্তি ও গুণাবলীর উপর আত্মার আধিপত্য। এ সকল জ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। দ্বিতীয়, বিশ্বজ্ঞান–বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র বাদশাহীর সঙ্গে ফেরেশতাগণের সম্পর্ক ও এই সকল ফেরেশতার মধ্যে একের সহিত অপরের সম্বন্ধ এবং আসমান, আরশ ও কুর্সীর সহিত ফেরেশতাগণের সম্পর্ক। ইহাও এক বড় জ্ঞান। এ কথার আভাস দিবার উদ্দেশ্য এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথাগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং উহা হইতে আল্লাহ্র মহত্ত্ব অনুভব করিবে। পক্ষান্তরে নির্বোধ ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবে, কি কারণে সে অজ্ঞ ও ক্ষতিগ্রস্ত রহিল যে, এইরূপ প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ ও পরম সৌন্দর্যের আধার আল্লাহ্র দীদার লাভ করিতে পারিল না। বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্র জ্ঞান মানুষ কতটুকু লাভ করিতে পারে? তবে এতটুকু বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন বুঝিতে পারে যে, সে কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র!

জড়জগতের মূল নির্ণয়ে প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতির্বিদগণের ভুল ঃ প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতির্বিদগণের দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, তাহারা প্রকৃতি ও গ্রহ-নক্ষত্রদিগকেই যাবতীয় কার্য ও ঘটনার মূল বলিয়া মনে করে। তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন কোন এক পিপীলিকা কাগজের উপর দিয়া চলিবার সময় দেখিতে পাইল, কাগজের উপর কালির দাগ পড়িয়া এক প্রকার চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। তৎপর সেই পিপীলিকা কলমের অগ্রভাগের প্রতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করত প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল ঃ আমি চিত্র অঙ্কনের মূল তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। কলমই কাগজের উপর চিত্র অঙ্কন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পিপীলিকাটি নিশ্চিত হইল প্রকৃতিবাদিগণের অবস্থাও ঠিক

এইরূপ। সর্বশেষে কাজটি কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইল, ইহা ছাড়া তাহারা আর কিছুই দেখে না। অবশেষে ঐ পিপীলিকার পার্শ্বে আর একটি পিপীলিকা আসিল। সে প্রথমে পিপীলিকা হইতে দূরদর্শী এবং ইহার দৃষ্টিশক্তিও তদপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। সে প্রথম পিপীলিকাকে বলিল ঃ তুমি ভুল করিয়াছ। আমি কলমকে আজ্ঞাধীন দেখিতেছি। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, কলম ভিন্ন এক পদার্থ কলমকে চালাইয়া চিত্র অঙ্কন করিতেছে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি যাহা জানিয়াছি তাহাই ঠিক। অঙ্গুলী চিত্র অঙ্কন করে, কলম করে না। কারণ, কলম অঙ্গুলীর অধীনে চলিতেছে। জ্যোতির্বিদগণ এই পিপীলিকা সদৃশ। তাহাদের দৃষ্টি প্রকৃতিবাদীদের অপেক্ষা অধিক দূরে পৌঁছিয়াছে। তাহারা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহকে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অধীন দেখিতেছে বটে, কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রাদি যে ফেরেশতাগণের অধীন, তাহা বুঝিতে পারে নাই এবং ফলে তাহারা জ্ঞানের তদপেক্ষা উপরের স্তরসমূহে পৌঁছিতে পারে নাই।

জ্ঞানের তারতম্যানুসারে জ্ঞানীগণের মধ্যে প্রভেদ ঃ জড়জগতের কার্যাবলীর মূল কারণ সম্বন্ধে প্রকৃতিবাদী বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদদের মধ্যে যেমন প্রভেদ ঘটিয়াছে এবং এইজন্যই তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতে যাহারা উন্নতি করেন তাহাদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশ লোকই জড়জগত ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক জগতের দিকে উন্নতি করিতে পারেন নাই। জড়জগতের বাহিরের কোন জিনিসই তাহারা দেখে নাই। তাহারা আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপানেই রহিয়া গিয়াছেন এবং এইদিকে তাহাদের উন্নতির পথ বন্ধ রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগত অতি দুর্গম ও বহু বাধা-বিপত্তি পরিপূর্ণ। এই জগতে উন্নতির স্তর অনুসারে কাহারও অবস্থা তারকাতুল্য কাহারও অবস্থা চন্দ্রসদৃশ, কাহারও মর্যাদা সূর্যতুল্য। আল্লাহ্ তা'আলা ঊর্ধ্ব জগতের যাঁহাকে যত অধিক দেখাইয়াছেন তদনুসারেই তাঁহাদের গৌরবের শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে; যেমন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ "এইরূপে আমি ইবরাহীমকে আকাশ ও পৃথিবীর রাজস্যসমূহ দেখাইয়াছি।" এই সমস্ত দেখিয়াই হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম বলিয়াছিলেনঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমার মুখ তাঁহার দিকে ফিরাইলাম যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।" আর এই কারণেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "নিশ্চয়ই সত্তর হাজার নূরের পর্দা আছে। এই সমস্ত দূর করা হইলে

তাঁহার মুখমণ্ডলের জ্যোতি দর্শকগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।" ইহার বিশদ ব্যাখ্যা 'মিশকাতুল আনওয়ার' ও 'মিসবাহুল আসরার' কিতাবদ্বয়ে দেওয়া হইয়াছে। তথায় দেখিয়া লওয়া উচিত।

জড়জগতের মূল নির্ণয়ে মতভেদ সম্বন্ধে সত্যাসত্যের বিচার ঃ উপরে যাহা বলা হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য হইল, জড়বাদীগণ কোন বস্তুর সৃষ্টির কারণরূপে যে উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এক হিসাবে সত্য, উহা জানাইয়া দেওয়া। কারণ, জড়জগতের ক্রিয়া-কলাপে আল্লাহ্ যে সমস্ত উপকরণ রাখিয়াছেন উহাতে এই সকল না থাকিলে চিকিৎসাশাস্ত্র অকর্মণ্য হইয়া পড়িত। কিন্তু তাঁহারা এইজন্য ভুল করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত কম ও সংকীর্ণ। ফলে ইহা তাঁহাদিগকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারে নাই এবং তাঁহারা প্রথম সোপানেই রহিয়া গেলেন। তাঁহারা উষ্ণতা, আর্দ্রতা প্রভৃতি উপাদানগুলিকে মূল কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিলেন, এই সমস্তকে অপরের অধীন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, উহাদিগকে ভৃত্য না বুঝিয়া কর্তা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। অথচ উষ্ণতা, আর্দ্রতা, ইত্যাদি উপাদান প্রকৃত কর্তার ভৃত্যগণের মধ্যে সর্বনিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যস্বরূপ। জ্যোতির্বিদগণ গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে আল্লাহ্র জাগতিক কার্যাবলী ও ঘটনাসমূহের উপকরণ বলিয়া ঠিকই করিয়াছেন। কারণ, উহারা আল্লাহ্র জাগতিক কার্যাবলীর উপরকণ না হইলে দিবা-রাত্রের প্রভেদ থাকিত না-শীত-গ্রীষ্ম সমান হইত। কেননা, সূর্য একটি গ্রহ; ইহা হইতেই পৃথিবীতে আলো ও উত্তাপ আসিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য মধ্যগগনের নিকটে থাকে বলিয়া গ্রীষ্ম হয় এবং শীতকালে দূরে থাকে বলিয়া শীত হয়। যে-আল্লাহ্র এই শক্তি রহিয়াছে যে, তিনি সূর্যকে উষ্ণ ও উজ্জ্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে শনিগ্রহকে শীতল ও শুষ্ক এবং শুক্রগ্রহকে উষ্ণ ও আর্দ্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? এরূপ বিশ্বাসে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু জ্যোতির্বিদগণ গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে জাগতিক ঘটনাবলীর মূল কর্তা সাব্যস্ত করিয়া মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে অন্য এক শক্তির অধীন বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারে নাই; অথচ এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ـ

অর্থাৎ "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নির্দেশমত নিয়ম-কানুনের অধীনে চলিতেছে।" তিনি আরও বলেন ঃ

وَالشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ـ

অর্থাৎ "সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁহারই অনুগত!" প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতির্বিদগণ এই সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই। অনুগত তাহাকেই বলে যে অপরের অধীনে কাজ করে। অতএব গ্রহ-নক্ষত্রাদির কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই, বরং ইহারা ফেরেশতাগণের পরিচালনাধীনে থাকিয়া কাজ করে। স্নায়ুসূত্র দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আলোড়িত করিলে যেমন মস্তিষ্কের শক্তি কার্যনির্বাহে অগ্রসর হয় তদ্রূপ আল্লাহ্র নিয়োজিত ফেরেশতাগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে। আল্লাহ্র ভৃত্যদের মধ্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি নীচ শ্রেণীর ভৃত্য বটে; কিন্তু চারি প্রকৃতি যেমন লেখকের হস্তস্থিত সর্বনিম্ন শ্রেণীর আজ্ঞাবহ কলমের ন্যায় ভৃত্য তদ্রূপ উহারা একেবারে নিম্নতম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে।

লোকদের মধ্যে মতভেদের কারণ ঃ লোকের মধ্যে এমন বহু মতভেদ আছে বিভিন্ন কারণে যাহাদের প্রত্যেকের কথাই সত্য। এরূপ মতভেদের কারণ এই যে, তাহাদের কেহ বা কোন বিষয়ের কিয়দংশ দেখিয়া বুঝিয়াছে, অপর অংশ দেখে নাই; আবার অপর লোক অন্য অংশ দেখিয়াছে, সম্পূর্ণটা দেখে নাই; অথচ তাহারা সকলেই সম্পূর্ণটা দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে। এমন লোকের অবস্থাকে 'অন্ধের হস্তী দর্শনে'র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অন্ধগণ তাহাদের শহরে হাতী আসিয়াছে শুনিয়া ইহা কেমন জানিবার জন্য রওয়ানা হইল এবং মনে করিল যে, হাতীর শরীরে হাত বুলাইয়া উহার যথার্থ পরিচয় লাভ করা যাইবে। সকলেই হাতীর শরীরে হাতড়াইতে লাগিল। কাহারও হাত হাতীর কানের উপর পড়িল; কাহারও হাত ইহার পায়ের উপর পড়িল; আবার কেহ ইহার দাঁত স্পর্শ করিল। এই অন্ধগণ অপর অন্ধদের নিকট গেলে তাহারা ইহাদিগকে হাতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তির হাত হাতীর পায়ের উপর পড়িয়াছিল সে বলিল ঃ হাতী থামের মত; যে ব্যক্তির হাত হাতীর দাঁত স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিল ঃ হাতি মূলার মত; যে-ব্যক্তি হাতির কান স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিল ঃ হাতী কুলার মত। পৃথক পৃথক কারণে তাহাদের প্রত্যেকের মতই কিছুটা সত্য বটে। কিন্তু তাহারা সকলেই এই কারণে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই হাতীর সমস্ত শরীরের পরিচয় না পাইয়াই বলিয়াছে ঃ "আমি হাতীকে সম্পূর্ণ রূপে চিনিয়াছি"; অথচ গোটা হাতীর পরিচয় তাহাদের কেহই লাভ করে নাই।

এইরূপে জ্যোতির্বিদ ও প্রকৃতিবাদীদের দৃষ্টি আল্লাহ্র এক এক বান্দার উপর পড়িয়াছে এবং ইহাদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা দর্শনে অবাক হইয়া বলিয়াছে ঃ

هٰذَا رَبِّىْ অর্থাৎ "ইহাই আমার প্রভু।" কিন্তু যাঁহাদিগকে আল্লাহ্ হিদায়েত করিলেন তিনি এ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রাকৃতিক শক্তির অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন ঃ যাহাকে আমি আল্লাহ্ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম

তাহাতে অন্যের আজ্ঞাধীন এবং যাহা অন্যের আজ্ঞাধীন তাহা কখনই আল্লাহ্ হওয়ার উপযুক্ত নহে; তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন– لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ অর্থাৎ "আমি অস্তগামীদিগকে পছন্দ করি না।"

বিশ্বপ্রকৃতির কার্যনির্বাহের ধারা ঃ চারি প্রকৃতি,গ্রহ-নক্ষত্র, দ্বাদশ রাশি, কক্ষপথ এবং তদ্ব্যতীত মহান আরশ–এই সমস্তকে এক হিসাবে এমন এক রাজার রাজ্য-শাসন প্রণালীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যাঁহার একটি খাস কামরা আছে, এই কামরায় তাঁহার উযির বসিয়া রহিয়াছেন। কামরার চতুর্দিকে একটি বারান্দা আছে ইহার বারটি দরজা। প্রত্যেক দরজায় এক একজন সহকারী উযির উপবিষ্ট আছেন এবং সাতজন অশ্বারোহী উযির হইতে প্রাপ্ত শাহী আদেশ সহকারী উযিরগণের মারফতে পাইবার প্রতীক্ষায় অনবরত বারটি দরজার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। অশ্বারোহিগণ হইতে একটু দূরে চারিজন পেয়াদা ফাঁদ হাতে দাঁড়াইয়া শাহী নির্দেশের প্রতীক্ষায় অশ্বারোহীদের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র এই ফাঁদের সাহায্যে তাহারা কাহাকেও নির্দেশ অনুযায়ী শাহী দরবারে হাযির করিবে, কাহাকেও বা দূর করিয়া দিবে, কাহাকেও পুরস্কার প্রদান করিবে, আবার কাহাকেও শাস্তি দিবে।

আরশ উক্ত খাস কামরাতুল্য। এই স্থানে উযির অবস্থান করেন ঃ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা। গ্রহ-নক্ষত্রবিশিষ্ট আসমান বারান্দাস্বরূপ এবং দ্বাদশ রাশি বার দরজা সদৃশ। এই সকল দরজায় অবস্থিত সহকারী উযির-ফেরেশতাগণ উক্ত শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা অপেক্ষা মরতবায় একটু নিম্নে। ইহাদের এক একজনের উপর এক এক কাজের ভার আছে। সাতটি গ্রহ সাতজন অশ্বারোহী তুল্য। তাহারা দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত ফেরেশতাগণের নিকট হইতে আল্লাহর নির্দেশের প্রতীক্ষায় আসমানের চারিদিকে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক রাশি হইতে ইহাদের নিকট বিভিন্ন আদেশ আসিয়া থাকে। আগুন, পানি মাটি ও বায়ু এই চারি উপাদান সেই চারি পেয়াদাস্বরূপ। ইহারা নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া যায় না। উষ্ণতা, শীতলতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা এই চতুর্বিধ প্রকৃতি উহাদের হস্তস্থিত চারিটি ফাঁদ।

রোগ-শোক প্রদানের কারণ ও রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন মত ঃ যদি কাহারও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া দুনিয়া হইতে সে মুখ ফিরাইয়া লয়–দুঃখ ও অনুতাপ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে–দুনিয়ার নিয়ামত তাহার নিকট খারাপ বোধ হয় এবং অন্তিমকালের চিন্তা-ভাবনা তাহাকে ঘিরিয়া লয় তখন চিকিৎসকগণ বলিবেন ঃ মস্তিষ্ক বিকৃতিতে এ ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এক প্রকার ভেষজ পদার্থের পাঁচন ইহার ঔষধ। প্রকৃতিবাদিগণ তাহার সম্বন্ধে বলিবেন ঃ শীতকালের শুষ্ক বায়ুর কারণে মস্তিষ্কে শুষ্কতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার এ রোগ জন্মিয়াছে। বসন্তের স্নিগ্ধ বায়ু

মস্তিষ্কে প্রবেশ করত ইহাকে আর্দ্র না করিলে এ রোগ সারিবে না। জ্যোতির্বিদগণ বলিবেন ঃ এই ব্যক্তির উন্মাদনা রোগ হইয়াছে। বধু গ্রহের সহিত মঙ্গল গ্রহের অশুভ সংক্রমণ হইয়া এই দুই গ্রহের কুদৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে বলিয়াই এ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। চন্দ্র-সূর্য বা অন্য কোন শুভ গ্রহের সহিত সংক্রমণ হইয়া তাহার উপর ইহার শুভ-দৃষ্টি না পড়িলে এ রোগ দূর হইবে না। চিকিৎসক, প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতির্বিদ তাহাদের নিজ নিজ চিন্তাধারা অনুযায়ী এ ব্যক্তি সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবার হইতে সৌভাগ্যের আদেশ হইল। তদানুসারে বুধ ও মঙ্গল গ্রহকে তিনি অনুমতি করিলেন যেন ইহারা একত্রে উদিত হইয়া তাঁহার অন্যতম পিয়াদা বায়ুকে শুষ্কতার ফাঁদের সাহায্যে ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্ক শুষ্ক করিয়া ফেলিবার ইঙ্গিত করে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি হইতে তাহার মুখ ফিরাইয়া লয় এবং অনুতাপ ও ভয়ের চাবুক মারিয়া তাহাকে আল্লাহ্র দরবারের দিকে লইয়া যায়। চিকিৎসা-শাস্ত্র, প্রকৃতিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না। বরং এই খবর একমাত্র পয়গম্বরগণের ইল্‌মে নবুয়তরূপ মহারত্নের অসীম সমুদ্র হইতে পাওয়া যায়। পয়গম্বরগণের জ্ঞান-সমুদ্র বিশ্ব-জগতের সমস্ত রাজ্য এবং আল্লাহ্র কর্মচারী ও ভৃত্যদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আর তাদের কে কোন্ কাজে নিযুক্ত আছে, কাহার আদেশে পরিচালিত হয় এবং সৃষ্টিকে কোন্ দিকে লইয়া যায় ও কোন্ দিকে যাইতে বাধা দেয়– এ সমুদয় কেবল পয়গম্বরগণই জানেন। তথাপি উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পণ্ডিতগণ যাহা বরেন তাহা এক হিসাবে সত্য বটে। তবে পার্থক্য এই যে, বিশ্বজগতের বাদশাহ্, তাহার বিশাল রাজ্য, প্রধান প্রধান কর্মচারী ও ভৃত্যগণের সংবাদ তাহারা কিছুই রাখেন না। তাহারা এমন মূর্খ পল্লীবাসীর ন্যায় যে বাদ্‌শাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যসামন্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং তাঁহার কর্মচারীবৃন্দকে দেখিয়া বলে ঃ "আমি বাদ্‌শাহকে দেখিয়াছি।" তাহার এরূপ উক্তি এক হিসাবে সত্য। কারণ, সে বাদ্‌শাহের দরবারকে বাদশাহের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহার উক্তির বিপরীত ছিল। কেননা, সে বাদশাহের দরবারের গোলামকে দেখিয়া তাহাকেই বাদশাহ বলিয়া মনে করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহার উক্তির বিপরীত ছিল। কেননা, সে বাদশাহের দরবারের গোলামকে দেখিয়া তাহাকেই বাদশাহ বলিয়া মনে করিয়াছিল।

ফলকথা, আল্লাহ্ মানুষকে বিপদাপদ, রোগ, উন্মাদনা ও কষ্ট দ্বারা নিজের দিকে আহবান করিতেছেন এবং বলিতেছেন ইহা রোগ নহে, বরং ইহা আমার দয়ারূপ ফাঁদ। এই ফাঁদ দ্বারা আমি আমার বন্ধুগণকে আমার দিকে আকর্ষণ করিয়া লই।

اِنَّ الْبَلَاءَ مُوْكَلٌ بِالْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পয়গম্বরগণকে বড় বড় বিপদে নিপতিত করিয়াছেন এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিপদ ওলীদের উপর দিয়াছেন। তৎপর তাঁহার বান্দাগণের মর্যাদার তারতম্য অনুসারে লঘু হইতে লঘুতর বিপদে তাহাদিগকে ফেলিয়াছেন।" এই সকল লোকগণের সম্বন্ধেই হাদীসে আল্লাহ্র উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ -

অর্থাৎ "আমি পীড়িত হইয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা কর নাই।"

মানব-দেহের অভ্যন্তরে যে বাদ্শাহী চলিয়াছে তাহা প্রথম উদাহরণে বর্ণিত হইল এবং দেহের বাহিরে যে বাদ্শাহী চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় উদাহরণে প্রকাশ পাইল। নিজকে চিনিলেই মানব-দেহের বাহিরের বাদশাহী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জন্যই আত্ম-দর্শন প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ্র মা'রিফাতের সমষ্টিরূপে চারিটি বাক্যের ব্যাখ্যা

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ পবিত্র', 'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র,' 'আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই' এবং 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাক্যগুলির তাৎপর্য এখন তোমার বুঝিয়া লওয়া দরকার। এই চারিটি বাক্য নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও আল্লাহ্র মা'রিফাতের সমষ্টি। নিজের পবিত্রতা দৃষ্টে যখন আল্লাহ্র পবিত্রতা তুমি বুঝিলে তখন 'আল্লাহ্ পবিত্র' এই কলেমার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলে। নিজের বাদ্শাহী চিনিয়া যখন আল্লাহ্র বাদ্শাহী সংক্ষেপে চিনিতে পারিলে– যেমন কলম লেখকের হাতের অধীন তদ্রূপ সমস্ত উপাদান ও মধ্যবর্তী কারণ একই আল্লাহ্র আজ্ঞাধীন– তখন 'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র' এই বাক্যের মর্ম উপলব্ধি করিলে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ যখন নিয়ামতদাতা নাই তখন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই শোভন, তাঁকে ছাড়া অপর কেহই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাইতে পারে না। যখন বুঝিতে পারিলে যে, তিনি ব্যতীত অপর কাহারও আজ্ঞা করিবার স্বাধীন ক্ষমতা নাই তখন 'আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই' এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝিলে। 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ট,' এই বাক্যের মর্ম এখন বুঝিয়া লও। জানিয়া রাখ, তুমি যত বড় জ্ঞানীই হও না কেন, মহান আল্লাহ্র হাকীকত তুমি কখনও বুঝিতে পারিবে না। কারণ, তিনি এত মহান ও শ্রেষ্ঠ যে, মানব কল্পনায় ইহা অনুধাবন করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। নতুবা তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কোন তুলনা নাই যদ্দ্বারা তুমি তাহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া

লইতে পারিবে। বরং আল্লাহ্ ব্যতীত বিশ্বজগতে অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই যাহার তুলনায় তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইবে। বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই আল্লাহ্র অস্তিত্বের নূর। সূর্যের আলো সূর্য হইতে পৃথক কোন বস্তু নহে। অতএব, আলো অপেক্ষা সূর্য শ্রেষ্ঠ, এরূপ বলা চলে না। তদ্রূপ জগতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র নূর। সুতরাং তাঁহাকে কোন কিছুর সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া অর্থ এই যে, বুদ্ধি বা কল্পনা দ্বারা কেহই তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। তিনি বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অসম্পূর্ণ ঃ আল্লাহ্র পবিত্রতা কি মানুষের পবিত্রতার অনুরূপ? এরূপ ধারণা হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন। তাঁহার তুলনায় মানুষ তো কিছুই নহে। সমস্ত সৃষ্টির সহিত তুলনা হইতে তিনি পবিত্র। মানুষের যে বাদশাহী তাহার নিজ শরীরের উপর চলে আল্লাহ্র বাদশাহী কি মানুষের এই বাদশাহীর তুল্য? আল্লাহ্র জ্ঞান ও শক্তি কি মানুষের জ্ঞান ও শক্তির অনুরূপ? নাউযুবিল্লাহ; কখনও নহে, কখনও এরূপ চিন্তা মনে স্থান দিও না। কিন্তু আল্লাহ্র ঐ সকল গুণের নামেমাত্র সামঞ্জস্য মানবের মধ্যে এইজন্য রাখিয়াছেন যেন সে নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় হওয়া সত্ত্বেও পরম করুণাময় আল্লাহ্র অনুপম সৌন্দর্য ও গুণাবলী কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে। ইহা বুঝাইবার জন্য একটি উপমা দেওয়া হইতেছে। কোন বালক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল–প্রভুত্ব ও বাদশাহীতে কিরূপ আনন্দ পাওয়া যায়? আমি উত্তরে বলিব–ডাণ্ডাগুলী খেলায় যেমন আনন্দ পাওয়া যায় প্রভুত্ব এবং বাদশাহীতেও তদ্রূপ আনন্দ মিলে। এরূপ উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, ঐ বালক ডাণ্ডাগুলীর আনন্দ ব্যতীত কোন আনন্দ জানেই না এবং যে আনন্দ সে লাভ করে নাই তাহা কখনও সে বুঝিতে পারিবে না। তবে বালকের হৃদয়ে কোন প্রকার আনন্দের লেশমাত্রও না থাকিলে তাহাকে উহা বুঝান কঠিন হইত। সকলেই জানে যে, বাদশাহীর আনন্দের সহিত ডাণ্ডাগুলীর আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। তথাপি উভয়ের নামই আনন্দ। তাই নামের মিলে উভয়ের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা গেল। আল্লাহ্র মারিফাতের ময়দানে যাহারা নাবালক তাহাদিগকে এইরূপ সাদৃশ্য দ্বারাই মা'রিফাতের আনন্দ বুঝাইতে হয়। আল্লাহ্র মারিফাত সম্বন্ধে যাহা বলা হইল এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসমুদয়ই ঐ প্রকার বালককে ডাণ্ডাগুলীর আনন্দ দ্বারা বাদশাহীর আনন্দ বুঝানোর ন্যায়। ফলকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার পূর্ণ হাকীকত কেহই বুঝিতে পারে না।

ইবাদত মানব-সৌভাগ্যের অন্যতম কারণ ঃ আল্লাহ্র মা'রিফাতের বিবরণ বিস্তৃত যে, এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার সম্যক বর্ণনা সম্ভব নহে। লোকে কিছুটা অবগত হইয়া

আল্লাহ্‌র যথাসাধ্য পূর্ণ পরিচয় লাভের আগ্রহ-উদ্দীপনা তাহার মনে জন্মাইয়া দেওয়ার জন্য যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। কারণ, আল্লাহ্‌র মা'রিফাতই মানব সৌভাগ্যের মূল। বরং সৌভাগ্যের উপায় হইল আল্লাহ্‌র মা'রিফাত ও ইবাদত-বন্দেগী। ইবাদত সৌভাগ্যের উপায় হওয়ার কারণ এই যে, মৃত্যুর পর একমাত্র আল্লাহ্‌র সহিতই তাহার সম্বন্ধ থাকিবে।

اِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَصِيْرُ -

অর্থাৎ "সকলেই একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাগমন ও পুনরাগমন করে।" আর যাঁর সহিত অবস্থান করিতে হইবে তাহার সহিত পূর্ব হইতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া লওয়াতেই সৌভাগ্য নিহিত আছে। বন্ধুত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে সৌভাগ্যও সে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, প্রিয়জনের দর্শনে আনন্দ ও আরাম মিলে এবং মারিফাতের ও যিকিরের ফলেই মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি পায়। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার কথাই অধিক মনে পড়ে। আবার যাহাকে অধিকাংশ সময় স্মরণ করা হয় সে স্বভাবতই প্রিয় হইয়া উঠে। এইজন্যই আল্লাহ্ হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের উপর ওহী নাযিল করিয়াছেন ঃ

اَنَا بُدُّكَ الأَزِمُ فَالْزِمْ بُدَّكَ -

অর্থাৎ "একমাত্র আমি তোমার আশ্রয়স্থল এবং কেবল আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ, অতএব আমার যিকির হইতে এক মুহূর্তও গাফিল থাকিও না।" মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদতে সর্বদা লিপ্ত থাকিলে তাহার মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ প্রবল হয় এবং প্রবৃত্তির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং সকল পাপ হইতে বিরত হওয়াই একাগ্রচিত্তে ইবাদতে রত হওয়ার মূল কারণ। আমার ইবাদত মনে যিকির প্রবল হওয়ার কারণে হইয়া থাকে। যিকির ও ইবাদত আবার মহব্বতের মূল কারণ এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত সৌভাগ্যের বীজ। আর সৌভাগ্যের বীজ। আর সৌভাগ্যের অর্থ হইল নাজাত লাভ করা; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ "অবশ্যই মু'মিনগণ নাজাত পাইয়াছে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى -

"যে ব্যক্তি আত্ম-শুদ্ধি লাভ করিয়াছে, আপন প্রভুর নাম স্মরণ করিয়াছে এবং নামায কায়েম করিয়াছে সে নিশ্চয়ই নাজাত পাইয়াছে।"

সকল কাজ ইবাদত হইতে পারে না; কোন কোন কাজ ইবাদত, কোন কোন কাজ ইবাদত নহে এবং সর্ববিধ প্রবৃত্তি হইতে বিরত থাকা সম্ভবও নহে, আর সঙ্গতও নহে। কারণ, আহার না করিলে মানুষ মরিয়া যায় এবং স্ত্রী সহবাস না করিলে বংশ রক্ষা পায় না। কতক প্রবৃত্তি একেবারে পরিত্যাজ্য এবং কতকগুলি গ্রহণীয়। সুতরাং গ্রহণীয়গুলি হইতে পরিত্যাজ্যগুলিকে পার্থক্য করিবার জন্য একটি মাপকাঠি ও সীমারেখা থাকা আবশ্যক। এই সীমারেখা নির্ধারণের দ্বিবিধ উপায় আছে। মানুষ হয়ত নিজে বিচার-বুদ্ধি ও ইচ্ছা অনুসারে তাহা নির্ধারণ করিয়া লইবে অথবা অন্যের দ্বারা উহা করাইয়া লইবে। সাধারণত মানুষকে নিজ স্বাধীন ক্ষমতার উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। কারণ, যাহার হৃদয়ে প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে সে কখনও সত্যের পথ পায় না এবং যাহা দ্বারা মানুষের অভিলাষ পূর্ণ হয় তাহা তাহার নিকট উত্তম বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। বরং এ বিষয়ে অন্যের অধীনে চলা উচিত। কিন্তু সকলেই পরিচালকের উপযুক্ত হইতে পারে না। কেবল দূরদর্শী ও প্রবল বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই পরিচালক হওয়ার উপযুক্ত। নবীগণই এই প্রকার দূরদর্শী ও সূক্ষ্ম বিচারক। তাঁহারা কর্তব্যাকর্তব্যের যে সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহাকেই শরীয়ত বলেন ঃ সুতরাং শরীয়তের অনুশাসন মানিয়া চলাই সৌভাগ্য অর্জনের উপায় এবং ইহার নামই ইবাদত।

শরীয়ত অমান্যকারীদের ভ্রমের সাতটি কারণ ঃ যে ব্যক্তি শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করে, সে নিজে নিজেই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। এইজন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তির আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সে নিজের উপরই অত্যাচার করে।" যাহারা হারামকে হালাল জানিয়া আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করিয়াছে তাহাদের ভ্রম ও অজ্ঞতার সাতটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ ঃ আল্লাহ্‌র উপর তাহাদের ঈমানই নাই। তাহারা নিজেদের খেয়াল ও কল্পনার বলে 'আল্লাহ্ কিভাবে হইলেন', 'তিনি কিরূপ' অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যখন কিছুই বুঝিতে পরিল না তখন স্বয়ং আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করিয়া বসিল এবং প্রকৃতি ও গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে জগতের সকল কার্যের মূল কারণ বলিয়া ধরিয়া লইল। তাহারা আরও মনে করিয়া লইল যে, মানব, জীবজন্তু এবং এই বিশ্বজগত আশ্চর্য অনুভূতি, চমৎকার কৌশল ও সুশৃঙ্খলার সহিত আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে; অথবা অনাদিকাল হইতে আপনা-আপনিই এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে বা এই সমস্তই প্রকৃতির কাজ। প্রকৃতিবাদিগণ যখন নিজেদের সম্বন্ধেই একেবারে অজ্ঞ তখন অন্যের সম্বন্ধে তাহারা কি জানিবে? তাহাদের উদাহরণ এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি সুন্দর

লেখা দেখিয়া ভাবিল, ইহা নিজে নিজেই হইয়াছে, লেখকের জ্ঞান ক্ষমতা ও ইচ্ছার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই অথবা ইহা এইরূপ লিখিত অবস্থাতেই অনাদিকাল হইতে আছে। যাহারা এতটুকু অন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহারা দুর্ভাগ্যের পথ হইতে কখনও ফিরিয়া আসিবে না জ্যোতির্বিদ ও প্রকৃতিবাদীদের ভ্রম পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ শরীয়ত-অমান্যকারিগণ আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না। কারণ, তাহারা মনে করে মানুষ ও তৃণলতা, বৃক্ষ এবং অন্য ইতর প্রাণীর ন্যায় মৃত্যুর পর ধ্বংস হইয়া যাইবে। মন্দ কৃতকর্মের জন্য তাহাকে পরকালে তিরস্কার করা হইবে না, কোন প্রকার হিসাব নিকাশ তাহার দিতে হইবে না এবং তথায় কোনরূপ দণ্ড বা পুরস্কার নাই। এইরূপ ব্যক্তিরা নিজদিগকে চিনে নাই। কেননা, তাহারা তাহাদিগকে গরু, গাধা, লতাপাতার ন্যায় মনে করে। মানবাত্মা যে দেহের মূল, অমর ও চিরস্থায়ী ইহা তাহারা জানে না। কেবল দেহরূপ কাঠামো হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। ইহাকেই মৃত্যু বলে। মৃত্যুর হাকীকত চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় কারণ ঃ আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর তাহাদের ঈমান আছে বটে, কিন্তু তাহাদের ঈমান নিতান্ত দুর্বল। শরীয়তের অর্থ না বুঝিয়া তাহারা বলে–'আমাদের ইবাদতে আল্লাহ্র কি প্রয়োজন? আমাদের পাপেই বা তাহার অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ কি? তিনি তো বিশ্বজগতের বাদশাহ এবং তিনি আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নহেন। তাহার নিকট পাপ-পুণ্য সবই সমান।' এই মূর্খেরা কি কুরআন শরীফে আল্লাহ্র আদেশ শ্রবণ করে নাই? আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়াছে সে একমাত্র নিজের মঙ্গলের জন্যই আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়াছে।" তিনি আরও বরেন ঃ

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পুণ্যলাভে কঠোর সাধনা করে সে নিজের জন্যেই তদ্রূপ সাধনা করিয়া থাকে। তিনি বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নেক কাজ করিয়াছে সে নিজের জন্যই করিয়াছে।" এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বান্দা যে নেক আমল করে উহার উপকারিতা তাহার নিজেরই, উহাতে আল্লাহ্র কোন লাভ নাই?

এই হতভাগ্য জাহিলগণ শরীয়তের অর্থ বুঝে না এবং মনে করে, শরীয়তের আদেশ নিষেধ মানিয়া চলা কেবল আল্লাহ্র জন্য, তাহাদের নিজের জন্য নহে।

তাহাদের দৃষ্টান্ত ঠিক এইরূপ যেমন, কোন রোগী নিজকে কুপথ্য হইতে রক্ষা করে না এবং বলে–আমি চিকিৎসকের উপদেশ মান্য করি বা না করি ইহাতে তাহার কি? তাহার কথা সত্য বটে; কারণ ইহাতে চিকিৎসকের কোন লাভ-লোকসান নাই। তবু কুপথ্য বর্জন না করিলে রোগী নিজেই বিনষ্ট হইবে। চিকিৎসকের প্রয়োজনের জন্য রোগী বিনষ্ট হইবে না, বরং কুপথ্য বর্জন না করার দরুন বিনষ্ট হইবে। সুস্থ হওয়ার জন্য চিকিৎসক তাহাকে কুপথ্য বর্জনের উপদেশ দিয়াছিলেন। রোগী তাহা মানে নাই; ইহাতে উপদেশদাতার কি ক্ষতি? বরং রোগী নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। শারীরিক রোগ যেমন এ জগতে ধ্বংসের কারণ আত্মার রোগও তদ্রূপ পরকালে দুর্ভোগের কারণ। ঔষধ সেবন ও কুপথ্য বর্জনে যেমন শারীরিক পীড়া দূর হয়, তদ্রূপ ইবাদত, মারিফাত ও পাপ বর্জনে আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয়। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্র নিকট নিষ্পাপ ও নিরোগ আত্মা লইয়া যাইতে পারিবে তাহারা ব্যতীত অপর কেহই মুক্তি পাইবে না।"

চতুর্থ কারণ ঃ শরীয়ত বিষয়ে অজ্ঞতার দরুন তাহারা বলে, কুপ্রবৃত্তি, ক্রোধ ও রিয়া হইতে হৃদয়কে পাকপবিত্র করিবার জন্য শরীয়ত আদেশ দিয়াছে, অথচ উহা নিতান্তই অসম্ভব। কারণ, মানুষকে আল্লাহ্ এই সকল প্রবৃত্তি দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা আরও বলে, কৃষ্ণ বর্ণকে শুভ্র বর্ণে পরিণত করা যেমন অসম্ভব, শরীয়তের এই আদেশ পালন ও তদ্রূপ অসম্ভব। কিন্তু এই নির্বোধগণ জানে না যে, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আদেশ শরীয়তে নাই; বরং এই সকল রিপুকে সায়েস্তা করত শরীয়ত ও বুদ্ধির অধীন করিয়া রাখিবার আদেশ রহিয়াছে যাহাতে ইহারা অবাধ্য হইতে না পারে এবং শরীয়তের সীমালঙ্ঘন না করে। রিপুগুলিকে এইরূপে দমন করিয়া কবিরা গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে করুণাময় আল্লাহ্ সগিরা গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ক্রোধ-লোভাদি রিপুকে বশীভূত করিয়া রাখা মানব-ক্ষমতা বহির্ভূত নহে। বহু লোকে ইহা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, কাম, ক্রোধ, রিপু থাকা উচিত নহে। অথচ তাহার নয়জন স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন–"আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ; মানুষের ন্যায় আমার হৃদয়েও ক্রোধের উদ্রেক হয়।" যাঁহারা ক্রোধ দমন করিয়াছেন তাহাদের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ -

অর্থাৎ "যাহারা ক্রোধ দমনকারী ও লোকের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শনকারী, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।" কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেকই হয় না, আল্লাহ্ তাহাদের প্রশংসা করেন নাই।

পঞ্চম কারণ ঃ তাহারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলে, "আল্লাহ্ দয়াময় ও ক্ষমাশীল যাহাই করি না কেন সর্বাবস্থায়ই তিনি আমাদের উপর দয়া করিবেন।" তিনি দয়াময় হইলেও যে আবার কঠিন শাস্তিদাতাও এ কথা তাহারা ভাবেন না। তাহারা দেখে না যে আল্লাহ্ দয়াময় ও ক্ষমাশীল হওয়া সত্ত্বেও এ জগতে বহু লোককে বিপদাপদ, রোগ-শোক এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিপতিত রাখিতেছেন। কৃষি ও বাণিজ্য না করিলে ধন পাওয়া যায় না, পরিশ্রম ব্যতীত বিদ্যালাভ হয় না–ইহা বুঝিয়া তাহারা দুনিয়ার কাজে পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। আল্লাহ্ পরম করুণাময়; কৃষিকার্য ও বাণিজ্য ব্যতীতই তিনি রিযিক দান করিবেন– এ কথা ভাবিয়া কেহই সাংসারিক কার্য হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া নিষ্কর্মা হইয়া থাকে না; অথচ আল্লাহ্ স্বয়ং সকল প্রাণীর রিযিকের যিম্মাদার, যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ـ

অর্থাৎ "পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার রিযিকের যিম্মাদার আল্লাহ্ নহেন।" এবং পরকালে উন্নতি ও সৌভাগ্য তিনি প্রত্যেকের আমলের উপর ন্যস্ত রাখিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى ـ

অর্থাৎ "মানুষ শুধু তাহার চেষ্টায় সফলতা লাভ করিয়া থাকে।" প্রকৃত প্রস্তাবে এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহ্‌কে করুণাময় বলিয়া বিশ্বাস করে না। কারণ, তাহারা আল্লাহ্‌র করুণার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জনে হস্ত সঙ্কুচিত করত নিষ্কর্মা বসিয়া থাকে না, কেবল পরকালের কার্যে শৈথিল্য করিয়া থাকে। সুতরাং পরকালের কার্যের বেলায় তাহারা যাহা কিছু বলে তাহা কেবল মৌখিক উক্তি এবং শয়তানের প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা সম্পূর্ণ অমূলক।

ষষ্ঠ কারণ ঃ এই সকল লোক গর্বিত হইয়া বলে ঃ "আমরা এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে, পাপ আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আমাদের অবস্থা দুই কুল্লা পানির মত; গুনাহের অপবিত্রতা আমাদিগকে অপবিত্র করিতেই পারে না।" (যে পাত্রে বিশ মণ পানি ধরে তাহাকে কুল্লা বলে। শাফেয়ী আলিমগণের মতে দুই কুল্লা পরিমাণ পানিতে সামান্য নাপাক মিশ্রিত হইলে পানি নাপাক হয় না।) এই নির্বোধের অনেকে এত সংকীর্ণ মনা যে, তাহাদের সহিত কেহ কোন বেয়াদবির কথা বলিলে এবং তাহাদের অভিমানে আঘাত হানিলে ও রিয়া প্রকাশ করিয়া দিরে তাঁহারা চিরতরে তাহার শত্রু হইয়া পড়ে; লালসার বস্তুর এক গ্রাস কম হইলে তাহারা দুনিয়া আঁধার দেখে। মানবতাগুণে যাহাদের স্বভাব এত সংকীর্ণ ও অনুদার, দুই কুল্লা পানির ন্যায় কোন পাপই তাহাদের ক্ষতি করিতে পারে না–এরূপ মিথ্যা দাবি করা তাহাদের

পক্ষে কি প্রকারে শোভা পায়? বস্তুত পাপ হইতে নির্ভয় হওয়ার ন্যায় উচ্চ মর্যাদায় এই নির্বোধগণ উপনীত হয় নাই। আর যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, শত্রুতা, ক্রোধ, লালসা, রিয়া হইতে ব্যক্তি বিশেষ একেবারে পাকপবিত্র তথাপি তাহার পক্ষেও তদ্রূপ দাবি করা অহংকারমাত্র। কারণ তাহার মরতবা কখনও পয়গম্বরগণের মরতবা হইতে বৃদ্ধি পাইবে না অথচ পয়গম্বরগণ সামান্য অসাবধানতা ও পদস্খলনের জন্য রোদন করিতেন এবং তওবা করিতেন। বড় বড় সাহাবা ছোট ছোট পাপ হইতেও সভয়ে দূরে থাকিতেন। বরং সন্দেহের ভয়ে হালাল বস্তু হইতেও তাঁহারা বহু দূরে সরিয়া পড়িতেন। পক্ষান্তরে এই নির্বোধগণ কিরূপে জানিল যে, শয়তানের প্রতারণায় তাহারা পড়ে নাই? আর কেমনে বুঝিল যে, পয়গম্বর ও সাহাবাগণ অপেক্ষা তাহাদের মরতবা বৃদ্ধি পাইয়াছে? এই নির্বোধগণ যদি বলে পয়গম্বরগণও এমন ছিলেন যে, পাপ তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিত না; কিন্তু মানবের শিক্ষা ও মঙ্গলের জন্য তাহারা সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে রোদন ও তওবা করিতেন তবে তাহারাও মানব জাতির মঙ্গলের জন্য তদ্রূপ করে না কেন? অথচ তাহারা দেখিতেছে যে, যে কেহ তাহাদের কথা ও কর্মের অনুসরণ করিতেছে সে-ই ধ্বংস হইতেছে। তাহরা যদি বলে, মানবজাতি ধ্বংস হইলে 'আমাদের কি ক্ষতি?' তবে দেখ রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেরই বা কি ক্ষতি ছিল? কোন ক্ষতিই না থাকিলে তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারিতে এত কঠোর সাধনায় লিপ্ত ছিলেন কেন? একদা তিনি অসাবধানতা বশত সাদকার একটি খেজুর মুখে দিলেন। কিন্তু সাদকার বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ইহা মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইহা তিনি খাইয়া ফেলিলে ইহাতে মানবজাতির কি ক্ষতি হইত? বরং তিনি খাইয়া ফেলিলে সাদকার মাল সকলের জন্য হালাল হইয়া যাইত। যদি বল, ঐ খেজুর ভক্ষণে তাঁহার অনিষ্ট ছিল, তবে বল দেখি, গামলা গামলা মদে কি এই নির্বোধদের কোন ক্ষতি নাই? মোট কথা এই নির্বোধদের মরতবা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মরতবা অপেক্ষা অধিক নহে এবং একটি সদকার খেজুর অপেক্ষা একশত গামলা মদ নিশ্চয়ই অধিক অপবিত্র এব কি এই হতভাগ্যরা নিজদিগকে মহাসমুদ্রের ন্যায় মনে করিতেছে যে, উহার মধ্যে শত শত গামলা মদ ঢালিয়া দিলেও উহা অপবিত্র হইবে না এবং রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি ক্ষুদ্র পানি পাত্র বলিয়া মনে করিতেছে যাহাতে একটিমাত্র খেজুর পড়িলেই পানি অপবিত্র হইয়া যাইবে! (নাউযুবিল্লাহ) বস্তুত শয়তান তাহাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে। আর দুনিয়ার নির্বোধ লোকেরা তাহাদিগকে লইয়া তামাশা করিতেছে। কেননা জ্ঞানিগণ তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে চাহেন না এবং তাহাদিগকে বিদ্রূপ করাও ঘৃণার কাজ বলিয়া মনে করেন। বুযর্গগণ জানেন, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে দমন ও বশীভূত করিতে অক্ষম সে মানুষ নামে যোগ্য নহে, বরং নরাকৃতি পশু।

জানিয়া রাখা উচিত যে, মানুষের রিপু নিতান্ত প্রবঞ্চক ও দাগাবাজ। ইহা অন্যায় দাবি করে, অসার বাহাদুরী দেখায় এবং নিজকে জবরদস্ত বলিয়া মনে করে। সুতরাং রিপুর নিকট হইতে সর্বদা ইহার দাবিদার সত্যতার প্রমাণ তলব করা সকলেরই কর্তব্য। রিপুগণ যখন স্বাধীনভাবে না চলিয়া শরীয়তের আজ্ঞাধীন থাকে এবং সর্বদা সন্তুষ্টচিত্তে শরীয়তের আদেশ মানিয়া চলে তখন ইহাদিগকে বিশ্বস্ত বলা যায়। কিন্তু শরীয়তের বিধান মান্য করার বেলায় ছল-চাতুরি ও টালবাহানা তালাশ করিলে সে শয়তানের গোলাম, যদিও সে নিজকে আল্লাহ্‌র ওলী বলিয়া দাবি করে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নফসের নিকট সাধুতার দাবির সত্যতার প্রমাণ তলব করা উচিত। অন্যথায় গর্বিত ও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নফসকে সর্বোতভাবে শরীয়তের আজ্ঞাধীন করিয়া রাখা মুসলমানীর প্রথম সোপান; অথচ সকলে একথা জানে না।

সপ্তম কারণ ঃ এ কারণটি লোকের গাফলতি ও খাহেশ হইতে উৎপন্ন হয়; অজ্ঞতা মূর্খতা ইহার কারণ নহে। প্রবৃত্তির দাস এই সকল মোহাবিষ্ট লোক হারামকে হালাল করিয়া লয় এবং উপরে তাহাদের মোহান্ধতার কারণ স্বরূপ যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা তাহারা বুঝে না। যাহারা হারামকে হালাল করিয়া লয়, সমাজে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। মিষ্ট ও চাটু কথা বলে এবং সূফীদের পোশাক পরিধানপূর্বক দরবেশীর দাবি করে তাহাদের দেখাদেখি এই শ্রেণীর লোকেরাও ঐরূপ কার্যে আনন্দ পায়। তাহাদের হৃদয়ে বাজে কাজ ও কামনার বস্তুর দিকে টান অধিক বলিয়াই তাহারা এই সকলের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। তাহরা জানে না যে, এই সকল কার্যের জন্য তাহারা পরকালে আযাব ভোগ করিবে। ইহা জানিলেও তাহাদের নিকট এই সকল কাজ তিক্ত ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। এই সমস্ত দুষ্কর্মের সমালোচকগণকে তাহারা মিথ্যা অপবাদকারী ও মনগড়া নূতন কথা বলেন বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকে; অথচ মিথ্যা অপবাদ ও মনগড়া নূতন কথা কাহাকে বলে তাহাও তাহারা জানে না। এই ধরনের লোক বাস্তবিক গাফিল ও প্রবৃত্তির গোলাম। তাহারা শয়তানের আজ্ঞাধীন। শত বুঝাইলেও তাহারা ঠিক হয় না। কারণ, তাহাদের অবলম্বিত পথ যে খাঁটি সত্য, ইহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেনঃ

اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۔ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذًا اَبَدًا ۔

অর্থাৎ "তাহাদের হৃদয়সমূহের উপর পর্দা পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কানের উপর বধিরতা চাপিয়া বসিয়াছে। এইজন্য তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। যদি আপনি তাহাদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করেন তথাপি অবশ্যই তাহারা কখনও পথ পাইবে না।"

এই সকল লোকের সহিত যবান দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া তলোয়ারের যবান দ্বারা কথা বলা উচিত।

শরীয়ত লঙ্ঘনকারী গাফিলদের স্বরূপ ও প্রতিকার ঃ যাহারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে তাহাদের ভ্রম-প্রদর্শন ও উপদেশ দান সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই যথেষ্ট। তাহাদের ভ্রম ও গোমরাহির কারণ এই–হয়ত তাহারা নিজকে চিনে নাই বা আল্লাহ্‌কে চিনে নাই কিংবা শরীয়তের জ্ঞান লাভ করে নাই। প্রকৃতির অনুকূল ব্যাপারে মানুষের অজ্ঞতা থাকিলে ইহা বিদূরিত করা বড় কঠিন। এইজন্যই লোকেরা নিঃসন্দেহে ও অনায়াসে হারামকে হালাল মানিয়া চলিয়াছে। তাহারা বলে, তাহারা হতভম্ব হইয়া রহিয়াছে। কোন্ বিষয়ে হতভম্ব হইয়া রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোন উত্তর দিতে পারে না। কারণ, তাহাদের সত্যের অনুসন্ধান নাই এবং যে গোমরাহির পথে তাহারা চলিয়াছে তদ্‌প্রতি তাহাদের কোন সন্দেহও নাই। তাহাদের অবস্থা এমন পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যে, চিকিৎসককে বলে, আমি পীড়ায় কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু কি পীড়ায় কষ্ট পাইতেছি তাহা সে বলে না। অতএব রোগ না জানিয়া চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে পারে না। তদ্রূপ লোকের অভিযোগের উত্তরে এইমাত্র বলা উচিত– তুমি যাহা চাহ তাহাতেই হতভম্ব থাক। কিন্তু এই বিষয়ে মোটেও সন্দেহ পোষণ করিও না যে, তুমি আল্লাহ্‌র একজন গোলাম, তোমার সৃষ্টিকর্তা অসীম ক্ষমতাশালী, অনন্ত জ্ঞানবান; তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

উল্লিখিত দলিল প্রমাণাদি দ্বারা এই ধরনের লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

দুনিয়ার পরিচয়

দুনিয়ার অর্থ ঃ দুনিয়া ধর্মপথে অবস্থিত একটি পান্থশালা এবং আল্লাহ্‌র দরবারে গমনকারীদের রাস্তা ও মারিফাতের মরুভূমি পার হইবার অভিলাষী পথিকদের পাথেয় খরিদের জন্য একটি সুসজ্জিত বাজার। মানুষের মৃত্যুর পূর্ববর্তী নিকটস্থ অবস্থাটিকে দুনিয়া এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাকে আখিরাত বলে। আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের জন্যই দুনিয়ার আবশ্যকতা। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় আল্লাহ্ মানুষকে নিতান্ত অপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, এমন যোগ্যতা তাহার মধ্যে থাকে এবং আধ্যাত্মিক জগতের ছবি নিজ হৃদয়পটে এমনভাবে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারে যে, আল্লাহ্‌র মহান দরবারে স্থান পাইবার যোগ্যতা লাভ করত তাঁহার অনন্ত রূপরাশি দর্শনে লিপ্ত থাকিতে পারে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই বেহেশ্‌ত লাভ হয় এবং ইহাই মানব সৌভাগ্যের চরম সীমা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ মানুষকে এই অবস্থা লাভের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পর্যন্ত মানবের আধ্যাত্মিক চক্ষু না ফুটিবে, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র চির অক্ষয় সৌন্দর্যের পরিচয় না পাইবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে বঞ্চিত থাকিবে। আল্লাহ্‌র মারিফাত দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌র আশ্চর্য শিল্প-কৌশলের পরিচয় লাভ করিলেই তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মানবের ইন্দ্রিয় দ্বারা আল্লাহ্‌র শিল্প-কৌশল চিনা যায় আবার পানি ও মাটি দ্বারা গঠিত এই দেহ পিঞ্জর ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের স্থিতি অসম্ভব। এইজন্য মানুষ এই পানি ও মাটির জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, পার্থিব জগত হইতে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবে। এবং আত্মপরিচয় ও বহির্জগতের জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করিবে। যতদিন ইন্দ্রিয়সমূহ মানুষের সহিত বিদ্যমান থাকিয়া সংবাদ সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকে, ততদিনই মানুষকে দুনিয়াতে আছে বলিয়া বলা হয়। অতঃপর ইন্দ্রিয়সমূহ বিদায় নিলে মানবাত্মা যখন কেবল স্বাভাবিক গুণে বিরাজমান থাকে তখন মানুষের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই মানবের দুনিয়াতে অবস্থানের উদ্দেশ্য।

মানুষের পার্থিব আবশ্যকতা ঃ দুনিয়াতে মানুষের দুই প্রকার বস্তুর আবশ্যক। প্রথম আত্মাকে ধ্বংসের কারণসমূহ হইতে রক্ষা করা এবং আত্মার আহার্য সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়, দেহকে ধ্বংসকারী কারণসমূহ হইতে রক্ষা করা এবং দেহের খাদ্য সংগ্রহ করা।

আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ ও তাহার মহব্বতই আত্মার আহার্য। কারণ, যাহা প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুযায়ী তাহাই খাদ্য। মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য পদার্থের মহব্বতে ডুবিয়া থাকা আত্মার ধ্বংসের কারণ। আত্মার জন্যই শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন; কেননা শরীর বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং আত্মা চিরস্থায়ী থাকিবে। আত্মার জন্যই যে শরীর আবশ্যক, ইহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কা'বা শরীফে যাইবার পথে হাজীর জন্য যেমন উটের আবশ্যক, আত্মার গন্তব্য পথে শরীরেরও তদ্রূপ আবশ্যক। হাজীর জন্যও উটের আবশ্যক, উটের জন্য হাজী নহে। কা'বা শরীফে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত উটের আবশ্যক এবং সেই পর্যন্ত আহারাদি দিয়া উটকে প্রতিপালন করাও হাজীর কর্তব্য। কিন্তু উটের পরিচর্যা আবশ্যক পরিমাণ হওয়া উচিত। পথ চলায় ক্ষান্ত দিয়া হাজী উটের আহার যোগাইতে ও সাজসজ্জা করিতে দিবারাত্র মশগুল থাকিবে সে কাফেলার পিছনে পড়িয়া বিনাশ হইবে। তদ্রূপ মানুষ দিবারাত্র শরীরের পরিচর্যা করিলে অর্থাৎ আহার সংগ্রহ, বাসস্থান নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে স্বীয় সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকিবে।

মানব শরীর রক্ষার জন্য তিন প্রকার বস্তুর আবশ্যক। (১) আহার্য বস্তু, (২) পরিধেয় বস্ত্র ও (৩) শীত, গ্রীষ্ম ও অন্যান্য বিপদাপদ হইতে হিফাজতের জন্য বাসস্থান। এই তিন প্রকার পদার্থ ব্যতীত মানুষের শরীর রক্ষার জন্য তাহার আর কিছুর আবশ্যক নাই। বস্তুত এই তিনটিই দুনিয়ার মূল।

আল্লাহ্‌র মারিফাত আত্মার খাদ্য। যত অধিক পরিমাণে ইহা লাভ করা যায় ততই মঙ্গল। আর খাদ্যদ্রব্য শরীরের আহার। সীমা ছাড়াইয়া অধিক আহার করিলে বিনাশের কারণ হয়। আল্লাহ্ মানুষকে খাহেশ প্রদান করিয়াছেন; উদ্দেশ্য এই যে, আহার বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য ইহা মানুষকে প্রেরণা দিবে যেন তাহার বাহনস্বরূপ দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। কিন্তু খাহেশের স্বভাব এই যে, সে সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক পাইতে চায়। খাহেশকে ইহার সীমায় ঠিক রাখিবার জন্য আল্লাহ্ বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খাহেশের সীমা নির্ধারণ করিয়া দিবার জন্য তিনি পয়গম্বরগণের মধ্যস্থতায় শরীয়ত প্রদান করিয়াছেন। দেহ রক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়া শৈশবকালেই আল্লাহ্ মানুষকে খাহেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহার পর বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাই খাহেশ বুদ্ধির অগ্রে মানব-মনে স্থান অধিকার করিয়া প্রবল হইয়া উঠে এবং বুদ্ধি ও শরীয়তের অবাধ্য হইয়া মানুষকে আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের অন্বেষণে দেহ-মনে ব্যাপৃত রাখে। এইজন্যই মানুষ নিজকে ভুলিয়া যায়। আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান আবশ্যক কেন, মানুষ কি জন্য দুনিয়াতে আসিয়াছে, আত্মার খোরাক ও পরকালের পাথেয় কি–এই সমস্তই সে তখন ভুলিয়া যায়। এই বর্ণনা হইতে দুনিয়ার অর্থ, ইহার আবাদ ও আবশ্যকতা বুঝা গেল। এখন দুনিয়ার শাখা-প্রশাখা ও দুনিয়াতে কি কাজ করিতে হইবে তাহা জানা আবশ্যক।

পার্থিব বস্তুর শ্রেণী বিভাগ ঃ দুনিয়ার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে বুঝা যাইবে যে, তিন শ্রেণীর বস্তু দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যথা– (১) ভূমিজাত-বস্তু, যেমন উদ্ভিদ; (২) খনিজ পদার্থ ও (৩) জীবজন্তু বাসস্থান ও কৃষিকার্যের জন্য ভূমির দরকার। বাসনপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের জন্য খনিজ পদার্থ, তামা, পিতল ও লৌহের আবশ্যক। আর বাহন ও খাদ্যের জন্য জীব-জন্তুর প্রয়োজন। মানুষ নিজের দেহ ও মনকে এই তিন শ্রেণীর বস্তু সংগ্রহেই মশগুল রাখে। মনকে এই সমস্তের কামনায় ও ভালবাসায় এবং হস্তপদকে এইগুলি সংগ্রহ ও নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত রাখে। মনকে এইরূপে লিপ্ত রাখার দরুন হৃদয়ে লোভ, কৃপণতা, শত্রুতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট গুণের উদ্রেক হয় এবং পরবর্তীকালে এইগুলি তাহার ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে। হস্তপদকে দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রাখিরে সঙ্গে সঙ্গে মনও উহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং মানুষ নিজকে ভুলিয়া একমাত্র দুনিয়ার কাজেই তাহার সর্বশক্তি নিযুক্ত রাখে।

পার্থিব ব্যবসায়ে পরস্পর নির্ভরশীলতা ঃ আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান যেমন সংসারের মূল তদ্রূপ মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকার্য ও ত্রিবিধ ঃ যথা–(১) স্বর্ণকারের কার্য, (২) বয়নকার্য ও (৩) স্থপতি কার্য। কিন্তু ইহাদের প্রতিটিরই শাখা-প্রশাখা আছে। কোন ব্যবসায়ী তো মূল শিল্পকার্যের উপাদান সংগ্রহ করে; যেমন ধনুকর ও সূত্রকরগণ, তাঁতীর আবশ্যক সূতা তৈয়ার করিয়া দেয়। দরজি আবার তাঁতীর কাজ পূর্ণ করে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীর জন্য আবার কাষ্ঠ, লৌহ, চর্ম ইত্যাদি দ্রব্য-নির্মিত যন্ত্রপাতির আবশ্যক। এইজন্যই কর্মকার, চর্মকার, সূত্রধরের ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং একে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। কারণ, কোন ব্যবসায়ীই নিজ নিজ ব্যবসায়ের জন্য আবশ্যক সমস্ত কার্য একাকী সম্পন্ন করিতে পারে না। এইজন্য তাহারা দুনিয়াতে পরস্পর জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। দরজি তাঁতি ও কর্মকারকে সাহায্য করে; কর্মকার আবার তাহাদের উভয়কে সাহায্য করে। এইরূপে দুনিয়াতে একজন অপরজনের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাতেই সমাজ-বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই কারণেই একজনের সঙ্গে অপরজনের শত্রুতা জন্মিয়াছে–একে অন্যের হক আদায়ে অনিচ্ছুক হইয়াছে–একজন অপরজনের ক্ষতি করিতে চেষ্টা

করিয়াছে। সুতরাং এই সমস্তের মীমাংসার জন্য অপর তিন শ্রেণীর কার্যের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে ঃ যথা– (১) শাসন ও সাম্রাজ্য পরিচালনা (২) বিচার ও (৩) আইন-প্রণয়ন। আইন-শাস্ত্র মানুষকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনকার্যের প্রণালী শিক্ষা দেয়। অন্যান্য ব্যবসায় হস্তপদের যেরূপ সম্বন্ধ আছে এইগুলিতে তদ্রূপ না থাকিলেও উহাদিগকে ব্যবসাই বলা চলে। এই কারণে দুনিয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহারা পরস্পর জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আর মানুষ এই সকল ব্যবসায় ডুবিয়া থাকিয়া নিজকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সংসারের ছলনায় মানবের ভ্রম ঃ মানব এ কথা বুঝে না যে সংসারের অসংখ্য ব্যবসায়ের মূল হইল একমাত্র আহার, পরিচ্ছদ এবং বাসস্থান। এই তিন পদার্থ লাভের জন্যই দুনিয়ার সকল ব্যবসা। আবার এই ত্রিবিধ পদার্থ শরীর রক্ষার জন্য। শরীর আত্মার বাহনের জন্য এবং আত্মা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। কিন্তু মানুষ নিজকে ও আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে। সে এমন হজ্জযাত্রীর ন্যায় যে নিজের উদ্দেশ্যে, কা'বা শরীফের কথা ও যাত্রার বিষয় ভুলিয়া গিয়া বাহন উটের পরিচর্যায় তাহার সমস্ত সময় অপচয় করে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই দুনিয়া ও দুনিয়ার অর্থ। যে ব্যক্তি দুনিয়া হইতে প্রস্থানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত না থাকে, আখিরাত যাহার একমাত্র লক্ষ্য না হয় এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজে আবশ্যকের অতিরিক্ত লিপ্ত হয়, সে দুনিয়াকে চিনে নাই। এই অজ্ঞতার দিকে ইঙ্গিত করিয়াই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুনিয়া হারুত ও মারুত অপেক্ষা অধিক যাদুকর; ইহা হইতে দূরে থাক।

দুনিয়ার ছলনার দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়া যখন এত বড় যাদুকর তখন ইহার ছলনা-প্রবঞ্চনা অবগত হওয়া এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার চাতুরি মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এখন দুনিয়ার ছলনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে ঃ

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়া নিজকে তোমার নিকট এমনভাবে দেখায় যে, তুমি মনে করিতেছ, সে চিরকাল তোমার সঙ্গে আছে। কিন্তু তাহা নহে, দুনিয়া সর্বদা তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে, আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতেছে। দুনিয়ার অবস্থা ছায়ার ন্যায়। ছায়াকে প্রথম দৃষ্টিতে স্থির বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রতি পলকে ইহা সরিয়া পড়িতেছে। তুমি জান, তোমার পরমায়ুও তদ্রূপ সর্বদা তোমা হইতে পলায়ন করিতেছে এবং তোমাকে দূরে সরাইয়া দিতেছে তাহাই দুনিয়া। অথচ তুমি একেবারে বেখবর।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়া তোমার নিকট নিজকে তোমার প্রেয়সী ও প্রেমিকারূপে উপস্থাপিত করে এবং প্রকাশ করে যে, সে কখনই তোমার সহিত প্রতারণা করিবে না

ও তোমাকে ছাড়িয়া কাহারও নিকট যাইবে না। কিন্তু সে হঠাৎ তোমাকে ছাড়িয়া তোমার দুশমনের নিকট চলিয়া যায়। দুনিয়া লম্পট কুলাটা রমণীয় ন্যায় পুরুষদিগকে নিজের প্রতি আসক্ত করিয়া আপন গৃহে লইয়া যায় এবং তৎপর তাহাদিগকে ধ্বংস করে। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম দুনিয়াকে কাশ্‌ফ দ্বারা বৃদ্ধা রমণীর মত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কয়টি স্বামী গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল ঃ অসংখ্য, গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাহারা মরিয়া গিয়াছে, না তাহারা তোমাকে তালাক দিয়াছে? সে বলিল ঃ না, আমি সকলকেই মারিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ ঐ সকল ও এই সমস্ত নির্বোধের ব্যাপার অতীব বিস্ময়কর। তুই অপরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিস তাহা দেখিয়াও তাহারা তোর প্রতি আসক্ত হইতেছে, উপদেশ গ্রহণ করিতেছে না। হে আল্লাহ্ আমাদিগকে দুনিয়ার যাদু হইতে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঃ বাহ্যিক আকৃতিতে দুনিয়া নিজকে সুন্দর সাজসজ্জায় বিভূষিত করিয়া রাখে এবং ইহার ভিতরে যে সকল বিপদ ও ক্লেশ আছে উহা লুকাইয়া রাখে যাহাতে নির্বোধগণ ইহার বাহ্য আকৃতি দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। দুনিয়া এমন এক বৃদ্ধা রমণীর ন্যায় যে আপন মুখমণ্ডল ঢাকিয়া বহুমূল্যবান বিচিত্র বেশভূশায় ও অলংকারে বাহ্য শরীর সর্বদা সজ্জিত রাখে এবং যাহাকে লোকে দূর হইতে দেখিয়া তৎপ্রতি একান্ত আশিক হইয়া পড়ে। কিন্তু তৎপর ইহার মুখমণ্ডল হইতে ঘোমটা উন্মোচন করত কুৎসিত আকার দেখিয়া লজ্জিত ও বিরক্ত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ দুনিয়াকে কদাকার বৃদ্ধার আকারে উপস্থিত করিবে। ইহার চক্ষু সবুজ থাকিবে, বড় বড় দাঁত মুখের বাহিরে দৃষ্টিগোচর হইবে। লোকের ইহাকে দেখিয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে ঃ এ কদাকার ও পাপিষ্ঠা রমণী কে? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলিবে ঃ ইহাই সেই দুনিয়া যাহার কারণে তোমরা পরস্পর হিংসা ও শত্রুতার বশবর্তী হইয়া একে অন্যের সহিত ঝগড়া ও মারামারি কাটা-কাটি করিতে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করত ইহার প্রেমে পাগল হইয়া পড়িতে। ইহার পর দুনিয়াকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন সে বলিবে ঃ হে আল্লাহ্, যাহারা আমার বন্ধু ছিল তাহারা কোথায়? আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তাহাদিগকেও ইহার সহিত দোযখে নিক্ষেপ কর।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত ঃ হিসাব করিলে দেখা যাইবে, সৃষ্টির আদিম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং আদিম সময়ে বহুকাল তাহার সহিত দুনিয়ার কোন সম্বন্ধই ছিল না। আবার শেষভাগেও অনন্তকাল দুনিয়া থাকিবে না। সুতরাং দুনিয়ার মুসাফিরের পথ-স্বরূপ। ইহার আরম্ভ সূতিকা-গৃহে ও শেষ কবর। উভয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট মঞ্জিল রহিয়াছে। প্রত্যেকটি

বৎসর যেমন ঃ এক একটি মঞ্জিল প্রত্যেকটি মাস এক একটি যোজন, প্রত্যেক দিন এক মাইল এবং প্রত্যেক নিঃশ্বাস এক পদক্ষেপ। আর মানুষ অবিরত চলিয়াছে। কাহারও সম্মুখে এক যোজন পথ রহিয়াছে, কাহারও অধিক কাহারও আবার কম। দুনিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু মানুষ মনে করে দুনিয়া সে স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল এইভাবেই থাকিবে। এই ধারণায় দুনিয়ার দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহে সে এমনভাবে মত্ত হয় যাহাতে আগামী দশ বৎসরে তাহার কোন অভাব অনটন না ঘটে। অথচ দশ দিনের মধ্যেই সে ইহলোক পরিত্যাগ করে।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়ার যে সমস্ত লোক সংসারের আপাতমধুর সুখ-শান্তিতে লিপ্ত হয়, ইহার বিনিময়ে পরকালে তাহারা অপমান ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবে। তাহাদিগকে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায় যে, ঘৃতাক্ত ও সুমিষ্ট উপাদেয় খাদ্য অধিক পরিমাণে আহার করে। ইহাতে তাহার পেটে ভীষণ অসুখ হইয়া পড়ে। ফলে তাহার বমি হইতে থাকে এবং মানুষের নিকট লজ্জিত ও অপমানিত হয়। উত্তম খাদ্য আহারজনিত সুখ তো আহারের সময়ই বিলীন হইয়া গেল; কিন্তু তজ্জনিত যন্ত্রণা ও লজ্জা থাকিয়া যায়। খাদ্য দ্রব্য যত উত্তম ও সুখাদ্য হয়, ইহার মলও তত অধিক দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে। এইরূপ দুনিয়া যাহার নিকট যত সুখকর আখিরাত তাহার নিকট তত অধিক কষ্টকর ও অপমানজনক হইবে। মৃত্যুর সময়ে এই সত্য আপনা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পার্থিব ধনৈশ্বর্য যেমন প্রমোদ কানন, দাসদাসী, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি যাহাদের যত অধিক মৃত্যুর সময় দরিদ্রের তুলনায় ইহাদের বিয়োগ-যন্ত্রণা তাহাদের তত অধিকই হইয়া থাকে। মৃত্যুতে এই যন্ত্রণার অবসান ঘটে না, বরং বৃদ্ধি পায়। কারণ, দুনিয়ার মহব্বত তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা চিরকাল বিদ্যমান থাকে।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ঃ প্রত্যেকটি সাংসারিক কাজ প্রথমত মানুষের নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। সে ভাবে এ কাজে অধিকক্ষণ লিপ্ত থাকিতে হইবে না। কিন্তু কার্যে প্রবৃত্ত হইলে ইহা হইতে আরও শত শত কার্যের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং সমস্ত জীবন এই সকল কার্যেই শেষ হইয়া যায়। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন ঃ দুনিয়া অন্বেষণকারী সমুদ্রের পানি পানকারীর ন্যায়। সে যত অধিক পান করে পিপাসা ততই বৃদ্ধি পায়। তৎপর সে পান করিতে করিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার পিপাসা কখনই মিটে না। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পানিতে গেলে শরীর যেমন না ভিজিয়া যায় না, তদ্রূপ দুনিয়ার কাজে প্রবৃত্ত হইলে কেহই কলুষিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

সপ্তম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়ায় আগত ব্যক্তির উপমা এইরূপ। মনে কর, কোন নিমন্ত্রণকারীর গৃহে কোন একজন মেহ্‌মান আসিল। নিমন্ত্রণকারীর এরূপ অভ্যাস যে,

তিনি সর্বদা মেহ্মানদের জন্য গৃহ সজ্জিত করিয়া রাখেন, মেহমানদিগকে তিনি দলে দলে আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মুখে নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করেন, আগরবাতি প্রজ্বলিত করেন এবং বিচিত্র রৌপ্যপাত্রে সুগন্ধি দ্রব্যাদি জ্বালাইয়া থাকেন। মেহমানগণ পান-ভোজনে সুগন্ধ দ্রব্য সেবনে মুগ্ধ হউক এবং অপর দলের জন্য ঐ সমস্ত স্বর্ণপাত্র ও ধূপদান রাখিয়া যাউক এই তাহার উদ্দেশ্য। মেহমানদের মধ্যে যাহারা নিমন্ত্রণকারীর রীতি অবগত আছে এবং বুদ্ধিমান তাহারা পান-ভোজন করিয়া ধূপদানে সুগন্ধিদ্রব্য নিক্ষেপ করত ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করে এবং স্বর্ণপাত্র ও ধূপদান রাখিয়া ধন্যবাদ দিতে দিতে আনন্দের সাথে চলিয়া যায়। কিন্তু নির্বোধ মেহমান মনে করে এই সকল স্বর্ণপাত্র, ধূপদান, আগরবাতি ও সুগন্ধিদ্রব্য নিমন্ত্রণকারী আমাকে দান করিয়াছেন, আমি এগুলি লইয়া যাইব। কিন্তু লইয়া যাওয়ার সময় যখন লোকে ঐ সমস্ত কাড়িয়া রাখিয়া দেয় তখন সে নিতান্ত দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। দুনিয়া যেন একটি মেহমানখানা। আখিরাতের পথিকদের জন্য ইহা উৎসর্গ করা হইয়াছে। ইহা হইতে শুধু পাথেয় সংগ্রহ করা এবং ইহার কোন দ্রব্য লইবার লোভ না করাই তাহাদের উচিত।

অষ্টম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়াদার লোক দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হইয়া আখিরাতের কথা ভুলিয়া যায়। ইহাদিগকে একদল নৌকারোহী যাত্রীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যাত্রাপথে নৌকা কোন দ্বীপে যাইয়া পৌঁছিল। আরোহীগণ মল-মূত্র পরিত্যাগ ও হস্তপদ ধৌত করিবার জন্য নৌকা হইতে অবতরণ করিল। নৌকার মাঝি ঘোষণা করিয়া দিল ঃ কেহই অধিক বিলম্ব করিতে পারিবে না, মল-মূত্র পরিত্যাগপূর্বক পাকসাফ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজে লিপ্ত হইতে পারিবে না। কারণ, নৌকা শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু যাত্রীরা দ্বীপে গিয়াই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যাহারা অতি বুদ্ধিমান, তাহারা তাড়াতাড়ি মল-মূত্র পরিত্যাগ করত পাকসাফ হইয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল। তখন নৌকা খালি থাকায় তাহারা নিজেদের পছন্দমত স্থান বাছিয়া লইল। অপর একদল যাত্রী দ্বীপের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখিবার জন্য রহিয়া গেল। তাহারা তথায় মনোরম পুষ্প, সুগায়ক পক্ষী, কারুকার্যখচিত প্রস্তর ও নানাবিধ রঙ-বেরঙের দ্রব্যাদি দেখিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যাগমন করত স্থান না পাইয়া সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারময় স্থানে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। অন্য একদল দ্বীপের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখিয়াই ক্ষান্ত হইল না, দ্বীপ হইতে ভাল ভাল পাথরসমূহ বাছিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু নৌকায় এইগুলি রাখিবার স্থান পাইল না। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে উপবেশনপূর্বক পাথরগুলি নিজেদের স্কন্ধের উপর রাখিল। দুই দিন পর ঐ বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরসমূহের রং পরিবর্তিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এখন এই কদাকার দুর্গন্ধময় প্রস্তরগুলি ফেলিয়া দিবার স্থানও

পাওয়া গেল না। তাই এই দলটি নিতান্ত লজ্জিত হইল এবং প্রস্তরের বোঝা নিজেদের স্কন্ধে রাখিয়া অপরিসীম যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সর্বশেষ দলটি দ্বীপের বিচিত্র দৃশ্যাবলী দর্শনে এত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, উহা দেখিতেই থাকিল। এদিকে নৌকা চলিয়া আসিল, উহারা দূরে পড়িয়া রহিল যে, উহা দেখিতেই থাকিল। এদিকে নৌকা চলিয়া আসিল, উহারা দূরে পড়িয়া রহিল। মাঝির নিষেধ না মানিয়া ঐ দ্বীপে রহিয়া গেল। তাহাদের কেহ কেহ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা পড়িল; আবার কতকগুলিকে হিংস্রজন্তু হত্যা করিল। প্রথম দলের বুদ্ধিমান লোকদিগকে পরহেযগার মুসলমানের সহিত তুলনা করা যায়। আর সর্বশেষ যে দলটি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও হিংস্রজন্তুর হস্তে প্রাণ হারাইল তাহারা কাফিরদের তুল্য। তাহারা নিজেকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার মোহে লিপ্ত ছিল। তাহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِسْتَحَبُّوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ "তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের জীবন অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছে।"

মধ্যবর্তী দুই দল গুনাহ্গার মু'মিনের তুল্য। তাহারা আসল ঈমান রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু দুনিয়া হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করে নাই। একদল দীনতার সহিত ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিয়াছে। অপর দল ভ্রমণের তৃপ্তি ভোগের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্কন্ধে স্থাপন করত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

দুনিয়াতে চিরস্থায়ী মঙ্গলের উপাদান ঃ দুনিয়ার অনিষ্টকারিতা যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে ভাবিও না যে, দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সবই মন্দ। বরং দুনিয়াতে এমন অনেক বস্তু আছে যাহা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, ইল্ম ও আমল দুনিয়াতে থাকিলেও দুনিয়ার অন্তর্গত নহে। কেননা এ দুইটি মানুষের সহিত পরকালে যাইবে। ইল্ম তো প্রকাশ্য তা সঠিকভাবে মানুষের সহিত থাকিবে এবং আমল সঠিকভাবে না থাকিলেও ইহার প্রভাব থাকিবে। সৎ আমলের প্রভাব দুই প্রকার। একটি আত্মার পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। ইহা পাপ পরিত্যাগের ফলস্বরূপ অর্জিত হইয়া থাকে। অপরটি আল্লাহ্র যিকিরের মহব্বত। ইহা সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকার ফলে অর্জিত হয়। এইগুলি চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক কার্যরূপে পরিগণিত। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ـ

অর্থাৎ "আর চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক কর্মসমূহ তোমার প্রভুর নিকট অতি উত্তম।"

পরকালের সহায়ক পার্থিব বস্তু অমঙ্গলজনক নহে ঃ ইল্ম ও মুনাজাতের আনন্দ এবং আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি আসক্তি, সংসারের সকল ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা মিষ্টতম।

এগুলি দুনিয়াতে থাকিলেও দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। এইজন্য দুনিয়ার সকল ভোগ্যবস্তুই মন্দ নহে। এমনকি যে সকল ভোগ্যবস্তু ধ্বংস হইয়া যায়, স্থায়ী থাকে না, তাহাদের সবই মন্দ নহে। ভোগ্যবস্তুও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম, যে সকল বস্তু দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসও হইয়া যায়, কিন্তু পরকালের কার্য ইল্‌ম ও আমলের সহায়তা করে এবং মুসলমানের বংশ বৃদ্ধি করে, এগুলি মন্দ নহে; যেমন বিবাহ, পানাহার-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান। এই সকল বস্তু পরিমাণগত ও পরকালের আবশ্যক অনুযায়ী ব্যবহার করিলে খারাপ নহে। প্রশান্ত মনে ইবাদতে লিপ্ত থাকিবার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এই সকল বস্তু আবশ্যক পরিমাণে লাভ করিয়া পরিতুষ্ট থাকে, সে দুনিয়াদার নহে। দ্বিতীয় পার্থিব বস্তুর মধ্যে যেগুলির উদ্দেশ্য পরকাল নহে। বরং যাহা ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা, অহংকার ও দুনিয়ার আসক্তি বৃদ্ধি করে এবং পরকালের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয় তাহাই ঘৃণ্য ও মন্দ। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّ مَلْعُوْنٌ مَّا فِيْهَا اِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ وَ الاٰهُ -

অর্থাৎ "দুনিয়া স্বয়ং অভিশপ্ত এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও আল্লাহ্‌র যিকিরকার্যে সাহায্যকারী ব্যতীত জগতে আর যাহা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।"

দুনিয়ার অর্থ ও দুনিয়ার উদ্দেশ্য বুঝাইতে উপরে যাহা বর্ণিত হইল এখানে এতটুকুই যথেষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়

পরকালের পরিচয়

আধ্যাত্মিক ও আদিভৌতিক বেহেশত-দোযখ ঃ মৃত্যুর অর্থ না বুঝা পর্যন্ত কেহই পরকালের অর্থ বুঝিতে পারে না। আবার জীবনের অর্থ বুঝিতে না পারিলে মৃত্যুর অর্থ বুঝিতে পারিবে না। আত্মার মর্ম না বুঝিয়া জীবনের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। আত্মার মর্ম উপলব্ধি করার নামই নিজকে চেনা। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ দুই পদার্থে গঠিত–একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। আত্মা আরোহী ও শরীর ইহার বাহন। শরীরের কারণে পরকালে আত্মা এমন অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে যাহার দরুন সে বেহেশতের পরমসুখ অথবা দোযখের চরম শাস্তি ভোগ করিবে। ইহা ছাড়া শরীরের কোন সম্পর্ক ও অধিকার ব্যতীত শুধু আত্মার আর একটি স্বাভাবিক অবস্থা আছে যাহার ফলে ইহাকে বেহেশতের সুখ বা দোযখের শাস্তি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। শরীরের সম্পর্ক ব্যতীত কেবল স্বাভাবিক অবস্থার জন্য আত্মা যে সুখ ও সৌভাগ্য ভোগ করিবে ইহা আধ্যাত্মিক বেহেশত ও শরীরের সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মা যে যন্ত্রণা ভোগ করিবে ইহা আত্মিক দোযখ। শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বেহেশত-দোযখের কথা সর্বজনবিদিত। রম্য কানন, সুন্দর স্রোতস্বিনী, সুনয়না সহধর্মিণী, সুরম্য অট্টালিকা, উপাদেয় পানাহার ইত্যাদি দৈহিক বেহেশতে পাওয়া যাইবে। অগ্নি, সর্প, বিচ্ছু, কণ্টকময় বৃক্ষ প্রভৃতি দৈহিক দোযখে রহিয়াছে। কুরআন হাদীসে দৈহিক বেহেশত-দোযখের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে এবং সকলেই উহা বুঝিতে পারে। আর 'ইয়াহ্‌ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে 'মওতের বর্ণনা' অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ স্থলে আধ্যাত্মিক বেহেশত-দোযখের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া মৃত্যুর অর্থ বিশদভাবে বর্ণিত হইবে। কারণ, মৃত্যুর হাকীকত সকলে অবগত নহে। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

اُعِدَّتْ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ -